বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট

এমাজ উদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

প্রকাশক ঃ সুলতান আহমদ

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯১ ইং

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
ও মুদ্রণে ঃ
চৌকস
১৩১, ডিআইটি এক্সটনেশন রোড,
ঢাকা-১০০০।

মূল্যঃ-২৫ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বাংলাদেশ রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক দল	১১
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্যা	১৯
বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক ঃ নির্ভরশীল ও দলছুট প্রবণতা	৩০
বাংলাদেশের সমস্যা ঃ ব্যক্তিত্ব কাঠামো	৩৩
জনগণ ও প্রশাসন	৩৮
জনগণ ও পুলিশ	৪৩
দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র	৪৬
বাংলাদেশ রাজানীতি ঃ জেনারেল এরশাদের উত্থান ও পতন	৫৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

গণতন্ত্রের প্রতি এ জাতির দুর্বলতা সর্বজন স্বীকৃত। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণ মরিয়া হয়ে লড়াই করেছে। অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। কোন কোন সময় হতাশ হয়েছে। রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের গালাগালিও দিয়েছে। প্রথম সুযোগেই আবার পথে নেমেছে, হতাশা ঝেড়েমুছে। মিছিলে যোগ দিয়েছে। জোর গলায় শ্লোগান দিয়েছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। গণ-আন্দোলনের তীব্রতায় তারা উল্লসিত হয়েছে। স্বৈরাচারের পতনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে হয়েছে সচকিত। এক অর্থে, বাংলাদেশে জনগণের ইতিহাস স্বৈরাচারের নির্মম শিকল ভাঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সব সময়ই রয়ে গেছে এ জাতির নাগালের বাইরে।

নব্বই শেষ হয়েছে আরো একটি বিজয়ের মধ্য দিয়ে। স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হয়েছে। মাত্র ক'মাস আগে জেনারেল এরশাদ বলেছিলেনঃ "ক'টা সভা করে সরকারের পতন ঘটানো যায় না। মিছিল করে অথবা হরতাল করে সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব নয়।" ১০ অক্টোবর বিরোধীদলের অবরোধ কর্মসূচীর দিনে জেনারেল এরশাদ ঠাট্টা করে বলেছিলেনঃ "বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা এবারে পথে বসেছে।"

জনগণ কিন্তু সব ওলোট-পালোট করে দিয়েছে। এরশাদ সরকারের পতন ঘটেছে। বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ হয়েছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। জনসমর্থনপুষ্ট বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীগণই আজকে রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। পথে বসেছেন এরশাদ নিজেই। প্রতিনিয়ত তার স্তুতিতে নিয়োজিত অমাত্য ও সভাসদরাও।

একটি সুষ্ঠু,অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে ২৭ ফেব্রুয়ারী। জনগণ নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এতবড় সুযোগ কারো অবহেলায় যেন বিনষ্ট না হয়। ছাত্র-জনতা, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী-পেশাজীবীদের সীমাহীন ত্যাগের ফলে সৃষ্ট এ সুযোগ যেন নষ্ট না হয়। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আবেগের ভূমিকা বড়, কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আবেগ নয় বরং সজ্ঞান প্রচেষ্টার গতিবেগই বড় কথা। স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে ছাত্র-জনতা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য এখন প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্বের সঠিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সর্বাগ্রে প্রয়োজন কতগুলো রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক ভিত্তিক ঐকমত্য (Consensus) প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছেঃ "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের

www.pathagar.com

অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" অন্যকথায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা ন্যাসী ক্ষমতা। জনগণের আমানত। এ ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। এর প্রয়োগ বিধিও সংবিধান কর্তৃক সীমিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি কোন সরকারের বিরুদ্ধে সীমা লংঘনের প্রমাণিত অভিযোগ আসে অথবা সুনির্দিষ্ট পন্থায় ক্ষমতা প্রয়োগে কোন সরকার ব্যর্থ হয় তবে সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ স্বরূপ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরে জোর প্রয়োগ বা সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই।

সংক্ষেপে, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ পদ্ধতি, ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার রূপ, ব্যর্থ হলে অন্য দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া–এ সব বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য অপরিহার্য। ঐকমত্যের অনুপস্থিতিই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের জনগণও আশা করে, দেশে নতুন ভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উষালগ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে হলেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হোক।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলতঃ দলীয় ব্যবস্থা। এক দলের কর্মসূচী ব্যর্থ হলে অন্যদলের কর্মসূচী শূন্যস্থান পূরণ করে। সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নীতি ও কর্মসূচী বাছাই–এর জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যেমন বাছাই করা হয় ব্যক্তি এবং ব্যক্তির সমন্বয়ে দল, তেমনি বাছাই করা হয় নীতি এবং কর্মসূচী। আজকে যে নীতি এবং কর্মসূচী জনগণকে আকর্ষণ করল না আগামীকাল হয়ত তাই সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পার্থক্য শুধু সময়ের এবং সুযোগের।

ক্ষমতাসীন দলের কার্যক্রমকে সমালোচনা এবং দলীয় কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করেই বিরোধীদল ক্ষমতা লাভের পথ সুগম করে। তাই বিরোধী দলের সমালোচনাকে 'জন স্বার্থ বিরোধী' বা 'ধ্বংসাত্মক' বলার অধিকার কারো নেই। দেশপ্রেম এবং জনসেবায় একচেটিয়া অধিকার সমাজ কাউকে দেয়নি। গত কয়েক বছরের আন্দোলনে জেনারেল এরশাদ বিরোধী দলের হরতাল এবং সভাসমিতিকে অসংখ্য বার ধ্বংসাত্মক আখ্যা দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি যতবার বলেছেন, তার বশংবদ পরিষদ প্রতিধ্বনি করেছেন তারও বহুগুণ। ক্ষমতাসীন আর বিরোধী দলের নীতি এবং কার্যক্রমকে ভ্রান্ত বা গণবিরোধী বলার অধিকার কারো নেই। তবে সমালোচনার ধরন, ভাষা ও ভাব সম্পর্কে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহমত সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। সমালোচনার উত্তাপে জনজীবন যেন জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ না হয় অথবা বিরোধিতার প্রবল স্রোতে রাজনৈতিক শুচিতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভেসে না যায়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন হলো আইনের শাসন। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সার্থক করতে হলে সমাজে ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে আইনের প্রতি আনুগত্য স্থিতিশীল করতে হবে। আইন মানতেই হবে, আইন মন্দ হলেও। যতদিন তা পরিবর্তিত না হচ্ছে। আইন প্রণয়ন এবং পরিবর্তন করবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সংসদে। আইনের শাসন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে যে যা পেতে পারে আইন অনুযায়ীই সে তা পায়। আইনের শাসন এমন এক পরিবেশে সৃষ্টি হয় যেখানে নেতার অনুকম্পা অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আইনের বাইরে কেউ কিছু পেতেও পারে না, কিছু থেকে কেউ বঞ্চিতও হয় না। এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি কারণ সমাজের অধিপতি শ্রেণী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কোনদিন আইনানুগ ছিলেন না। জেনারেল এরশাদ একদিকে সমাজে সন্ত্রাস বন্ধ করার কথা বলেছেন, অন্যদিকে তারই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। এমন কি নিজ গৃহে বহু সংখ্যক লাইসেন্স বিহীন আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষণ করেছেন। এরশাদের আগেও দেখা গেছে, আইনের শাসন সম্পর্কে যারা যতবেশী কথা বলেছেন, বে-আইনী কার্যক্রমে তারাই বেশী লিপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করতে হলে এসব বিষয়েও জাতীয় নেতৃত্বকে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।

দীর্ঘ ন'বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সার্বিক ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমাদের আশংকা, জাতীয় নেতৃত্ব এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেনি। গণ-আন্দোলনের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিলঃ 'সার্বভৌম সংসদ চাই', 'সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই'। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের দাবীনামায় এ দাবী স্থান পায়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এ শ্লোগান অত্যন্ত জোরে সোরে উচ্চারিত হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বহুদিন পরে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ এ জাতি পেতে যাচ্ছে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

কিন্তু কিভাবে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবে? জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম সংসদে রূপান্তরিত করতে হলে বাংলাদেশ সংবিধানের অন্তত আটটি অনুচ্ছেদের সংশোধন করতে হবে এবং তার ছয়টি ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়াও প্রয়োজন হবে গণ-সম্মতির। শুধু তাই নয়, জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম সংসদে রূপান্তরিত করতে হলে সরকার ব্যবস্থারও সার্বিক রূপান্তর ঘটবে। অন্যকথায়, বাংলাদেশে প্রবর্তিত হবে রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার। জাতীয় নেতৃত্বে এ বিষয়েও আছে কি কোন ঐকমত্য?

১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনী আইনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সংসদীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতিক সরকার প্রবর্তন করে। রাষ্ট্রপতি জিয়া সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন বটে, কিন্তু, রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখেছেন। জেনারেল এরশাদ পূর্ববর্তী সকল সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমনকি তার সরকার ছাড়া অন্যান্য সরকারকে 'অবৈধ' বলে চিহ্নিত করার দুঃসাহসও দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থাকে ''রাষ্ট্রপতিক লেভায়াথান'-এ (Presidential Leviathan) পরিণত করেন।

আসলে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থা সমানভাবে গণতান্ত্রিক। কিন্তু দশটি সংশোধনীর, বিশেষ করে চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনী আইনের পর, বাংলাদেশে যে সরকার ব্যবস্থা চালু

www.pathagar.com

হয়েছে তা সংসদীয়ও নয়, রাষ্ট্রপতিকও নয়। ঐসব সংশোধনী আইনের ফলে জাতীয় সংসদ হারিয়েছে তার গুরুত্ব। বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। নির্বাহী বিভাগে সংযোজিত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে অবাঞ্ছিত পেশী। মন্ত্রিরা হয়েছেন রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ। প্রশাসন হারিয়েছে তার চিৎশক্তি। নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলো রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে গ্রহণ করতে হবে হয় সংসদীয় ব্যবস্থা, না হয় অকৃত্রিম রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থা। উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে বাংলাদেশ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংশোধন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গণসম্মতির জন্য গণভোট। প্রচুর ব্যয়বহুল একটি সাধারণ নির্বাচনের পর গণভোট এবং তাও সংবিধান সংশোধনের জন্য। জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা না হলে তা সম্ভব হবে না। স্বৈরাচারের পতনের পর এখনও পরিবেশ আবেগ বিধুর। এখনও এসব বিষয়ে সকল মহলের দৃষ্টিভংগী নমনীয়। সাধারণ নির্বাচনের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। নির্বাচনে শুধু প্রতিনিধিত্বের আলোই মেলে না, অনুভূত হবে প্রতিযোগিতার উত্তাপও। জাতীয় সমস্যাগুলোকে আজকে যে আলোকে দেখা সম্ভব হচ্ছে ঐ পর্যায়ে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

এ দেশের ইতিহাসও তাই নির্দেশ করে। এখন পর্যন্ত এদেশে কোন সংসদ তার স্বাভাবিক কার্যকাল সমাপ্ত করেনি। ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের আয়ু শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ, অকালে। ১৯৮৬ সালে যে সংসদ নির্বাচিত হয় তা শেষ হয় ১৯৮৭ সালের শেষ প্রান্তে। ১৯৮৮ সালের সংসদ শেষ হয় নব্বইতে। সংসদের এমন করুণ ইতিহাস অন্য কোথাও দেখা যায় না। একটু পিছিয়ে গেলেও একই ছবি চোখে পড়ে। ১৯৪৬ সালে সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে সব জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন তাদের একাংশ সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের গণ পরিষদ। তেইশ বছরের পাকিস্তানে একবার মাত্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৭০ সালে। তার পরের ইতিহাস সবার জানা। অথচ প্রতিবেশী ভারতে, এমন কি শ্রীলংকায়ও নির্বাচিত সংসদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

অন্যদিকে এদেশের জনগণ রাজনৈতিকভাবে কম সচেতন নয়। এ জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা বিদেশীদের চোখেও পড়েছে। ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের একজন পর্যবেক্ষক, চার্লস বার্টন মার্শাল (Charles Burton Marshall) পাকিস্তানের দু'অংশের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ "পশ্চিম পাকিস্তান মূলত প্রশাসনিক, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিক।" আরও অনেক লেখকের লেখায় বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও এদেশে গণতান্ত্রিক জীবনের শুভ সূচনা এখনও হয়নি।

ইতিহাসের এ ক্লান্তিলগ্নে মৌল জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় নেতৃত্বে ঐকমত্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। ছাত্র–জনতা বারে বারে পথে নেমেছে গণতন্ত্রের জন্য, অথচ নেতৃত্বের সংকটে গণতন্ত্র এদেশে বারে বারে পথে বসেছে। এবারের সুযোগকে কাজে লাগাতে তাই প্রয়োজন

www.pathagar.com

একদিকে যেমন নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য।

১৯৮৯ এবং ১৯৯০ সালে গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মাত্র ৭টি লেখার সমন্বয়ে উপস্থাপিত হোল বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট। এগুলোর কয়েকটি এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে। "বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল" প্রবন্ধটি ১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারীতে প্রকাশিত মূলধারার মূল রচনা। "জনগণ ও প্রশাসন" বঙ্গব্যাপীর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়, ১৯৮৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। "বাংলাদেশের সমস্যা ঃ ব্যক্তিত্ব কাঠামো" প্রকাশিত হয় বিক্রম এবং সূর্যোদয়ে, ১৯৯০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর এবং ২৮ শে অক্টোবরে। "জনগণ ও পুলিশ" প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে, ১৯৮৯ সালের ৯ জানুয়ারী, পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে। "দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র" প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে, অজ্ঞাতবাসে। এটি দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনের সাথে লেখা। "বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাজনীতিক" প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালের ২৩ নভেম্বরে, বিক্রমে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছেন স্নেহভাজন সুলতান আহমদ।

বাংলাদেশ রাজনীতির এ শুভলগ্নে পাঠকদের নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলতে কোন প্রবন্ধ যদি সহায়তা করে তাহলে এ প্রকাশনা সার্থক হবে।

এমাজউদ্দীন আহমদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
৩ জানুয়ারী ১৯৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক দল

[ক]

সমাজে রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রধান সূচক হলো সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কের প্রকৃতি ও মান। এ সম্পর্ক সুষম হলে বুঝতে হবে সমাজ রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রগামী। হাজারো স্বার্থ-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় সমাজ। কোন্‌টি শ্রেণী-ভিত্তিক, কোন্‌টি অঞ্চলভিত্তিক, কোন্‌টি সম্প্রদায়ভিত্তিক এবং কোন্‌টি পেশা-ভিত্তিক। এসব গোষ্ঠীর রয়েছে সুনির্দিষ্ট স্বার্থ এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী চায় সে স্বার্থ সমুন্নত রাখতে। ফলে সামাজিক উপত্যকায় দেখা দেয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল হলো এসব ভিন্নধর্মী গোষ্ঠী-স্বার্থের সমন্বয়ের প্রতীক, পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে উপনীত সহমতের প্রত্যয় এবং সুষম সম্পর্কের মাধ্যম।

রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সমাজে ভিন্নমুখী স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও সমন্বয় সাধন সম্পন্ন হয়। মূলত রাজনৈতিক দলই সমাজে হাজারো সংঘর্ষকে ছাপিয়ে সংহতি অর্জনে সহায়তা করে। দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে মিলনের রজ্জু প্রসারিত করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্থলে জাতীয় নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলোকে জাতীয় স্বার্থের সোনালী বন্ধনে আবদ্ধ করে। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র উর্বর করে। তাই বলা হয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সুস্বাস্থ্যের উপর জাতীয় সংহতির গভীরতা ও ব্যাপকতা উভয়ই নির্ভরশীল।

সমাজে ভিন্নমুখী সামাজিক শক্তি (social forces) আছে বলেই রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে সুসংহত কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল জাতীয় জীবনে আনে স্বচ্ছন্দ এক গতি আর সৃষ্টি করে স্থিতিশীল এক নৈতিক ঐকমত্য (stable moral consensus)। সামাজিক শক্তিগুলো যত জটিল ও ভিন্নমুখী হয়, যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্য রাজনৈতিক দলকে ততই বিশেষীকৃত এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক হতে হয়।

নতুন রাষ্ট্রগুলোতে অবশ্য এ দু'য়ের সাম্যাবস্থা অনুপস্থিত। ফলে জাতীয় সংহতি ও জাতীয় চেতনার স্তর সে পরিমাণে নিচু। কোথাও ধর্মীয় স্বার্থের টানাপোড়েন রাষ্ট্রের ভিত্তিকে শিথিল করছে। কোথাওবা কুলগত দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তকরণ বিদীর্ণ করছে। কোথাও বা শ্রেণী স্বার্থ জাতীয় জীবনকে এক ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার কোথাও পেশাগত কোন কোন প্রতিষ্ঠানের দাপটে রাজনৈতিক ব্যবস্থা খণ্ডছিন্ন।

বাংলাদেশ একদিক থেকে অনেক বেশি ভাগ্যবান। এখানে কুলগত বিভাজন বা আঞ্চলিক স্বার্থ বা ভাষাগত বৈষম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য তেমন ভয়াবহ নয়। ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট অবিশ্বাসের মাত্রাও তেমন প্রকট নয়। তথাপি বাংলাদেশ এখনও সুসংহত এক জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা এখনো যেন স্বতন্ত্র দুই বিশ্বের বাসিন্দা। সমগ্র জনসমষ্টির চার-পঞ্চমাংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষিত এবং সাধারণ জনসমষ্টির চিন্তা-ভাবনায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষমতা প্রয়োগকারী এলিট গ্রুপের বক্তব্য, কার্যক্রম, চিন্তা-চেতনা এতই স্বতন্ত্র যে, সাধারণ লোকের মনে তা বিন্দুমাত্র শিহরণ জাগায় না। তা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে আঞ্চলিক,

www.pathagar.com

শ্রেণীভিত্তিক, পেশাভিত্তিক এবং ধর্মীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব। জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশ যেন রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে বন্দী। বাংলাদেশের ভিন্নমুখী সামাজিক শক্তিগুলোর চেতনা এখনও ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধে উঠে জাতীয় চেতনার সামগ্রিক সুরে ঝংকার তোলে না।

এর মূলে রয়েছে অনেক কারণ। তবে প্রধানতম কারণ হলো–এদেশে কর্তৃত্বব্যঞ্জক রাজনৈতিক দল শুধু যে অনুপস্থিত তাই নয়, বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতাও আকাশচুম্বি। স্বাভাবিকভাবে তাই প্রশ্ন ওঠেঃ এ সমাজে কেন রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না? কেন রাজনৈতিক দলগুলো যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে? এসব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর এ প্রবন্ধে নেই, তবে এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং কিছু পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

[খ]

জাতীয় সংহতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের রয়েছে কাঠামোগত এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্য। কাঠামোগতভাবে রাজনৈতিক দলের একদিকে যেমন থাকে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং সুস্পষ্ট কর্মসূচী, তেমনি থাকে সমর্থনের ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি সমন্বয়ে সংগঠিত জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশের অংশগ্রহণ। নৈতিক মাত্রায় রাজনৈতিক দল হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর স্থিতিশীল "আস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" (Institutionalization of Trust)। অন্য কথায়, রাজনৈতিক দলের যেমন থাকে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং সুস্পষ্ট কর্মসূচী, তেমনি থাকে এসব নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা এবং থাকে দলের প্রতি সাধারণ ও বিভিন্ন স্বার্থ–গোষ্ঠীর গভীর আস্থা। দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয় মানদণ্ডে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান অত্যন্ত নিম্নে। দেশে যদিও বেশ ক'ডজন রাজনৈতিক দল রয়েছে কিন্তু মাত্র কয়েকটির রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মসূচী আর রয়েছে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত সাংগঠনিক সূত্র। আরো অল্পসংখ্যক দলের রয়েছে ব্যাপক সমর্থন ভিত। এ সবের কারণ কি?

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের দৈন্যের কারণ নিহিত রয়েছে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যে,আর রয়েছে এ সমাজের আর্থ–সামাজিক কাঠামোয়। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্মের পরিবেশও এ জন্যে আংশিকভাবে দায়ী। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল কোন সময়ই সরকারী নীতি নির্ধারণ বা বিকল্প নীতি প্রণয়নের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়নি। তাছাড়া, রাজনৈতিক দল অবাধ কার্যক্রম গ্রহণেরও সুবিধা পেয়েছে খুব সামান্য। এ অঞ্চলে রাজনীতির গতিধারা কোনদিনই অবাধ ছিল না। রাজনীতির প্রবাহ বারে বারে আছাড় খেয়েছে সরকারী প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞার কঠোর শিলায়। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সব রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের কয়েকটির জন্ম হয়েছিল বৃটিশ পিরিয়ডে এবং অধিকাংশের জন্ম হয়েছে পাকিস্তান আমলে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক দলের সামনে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের মতো সাধারণ শত্রু। শত্রুর উৎখাতই ছিল রাজনৈতিক কার্যক্রমের লক্ষ্য, তা যে পদ্ধতিতেই হোক। জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ বা জাতীয় সংহতি অর্জনের মত ইতিবাচক পদক্ষেপ কোন সময় রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়নি।

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক আমলে দলীয় কাঠামো ছিল অপরিণত এবং দলীয় কার্যক্রম ছিল অনেক সময়ই হয় বে-আইনী, না হয় ভীষণভাবে সীমিত। অনেক রাজনৈতিক দলকে অন্ধকারেই বিচরণ করতে হয়েছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। ফলে দলীয় নীতির প্রচার বা দলীয় কর্মসূচীকে জনগণের নিকট উপস্থাপন করে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের উদ্যোগ তেমন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এসব কারণে রাজনৈতিক দল সুষম অগ্রগতি সাধনে হয়েছে ব্যর্থ। স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশের শাসনকারী এলিটবৃন্দ রাজনৈতিক দলের অবাধ কার্যক্রমকে সুনজরে দেখেননি। ঔপনিবেশিক আমলের বহু বাধা-বন্ধনকে অব্যাহত রাখেন। তাই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রচলিত রাজনৈতিক দলের তুলনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো রয়ে গেছে কাঠামোগতভাবে অপরিণত এবং কার্যক্রমের দিক থেকে অনভিজ্ঞ ও ষড়যন্ত্র প্রবণ।

তাছাড়া, উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ লাভ করেছে এমন এক রাজনৈতিক ঐতিহ্য যেখানে গণ-আন্দোলন এবং নির্বাচন একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। গত চার দশকে এ অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে বহু রাজনৈতিক আন্দোলন। আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন উঠে আসে কতকগুলো রাজনৈতিক ইস্যু, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি হয় বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা শক্তি। উন্নতবিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এক রাশি নীতি এবং কর্মসূচীর মধ্য থেকে কিছু নীতি ও কর্মসূচী এবং ঐ সকল নীতি ও কর্মসূচীর ধারক দলকে বাছাই করার জন্যে। এ দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলাফল হিসেবে ওঠে আসা রাজনৈতিক ইস্যুকে অনুমোদন দানের জন্যে, বিকল্পসহ এক রাশি কর্মসূচীর মধ্য থেকে একটি বা কয়েকটিকে বাছাই করার জন্যে নয়। আমাদের দেশে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক বা আধা- ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দুর্গে আঘাত হানা। এসব আন্দোলনে একটি বা দু'টি নয় বরং প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বিত কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট থাকতো। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো সে নির্বাচনে ভোটদাতারা ভোট কেন্দ্রে যেতেন বিশেষ কোন দলের সমর্থক হিসেবে নয়, বরং বৃহত্তর আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে। এক অর্থে ঐসব নির্বাচন ছিল না, ছিল এক ধরনের গণভোট। পাকিস্তান প্রশ্নে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন, ভাষা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ৬-দফা দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ছিল এই ধরনের নির্বাচন। প্রত্যেকটি নির্বাচন ছিল আপন আপন দিক থেকে বিশিষ্ট। প্রত্যেকটির প্রেক্ষিত ছিল স্বতন্ত্র এবং ভোটারদের নিকট প্রত্যেকটির আবেদন ছিল ভিন্ন।

এসব নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কাঠমোগত দিককে শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়নি, সমর্থ হয়নি নিজেদের কার্যক্রমকে আরও বেশি গণমুখী করতে। বরং এক একটা নির্বাচন-পরবর্তী পর্যায় কোন কোন দলের জন্যে নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে, যার চাপে কালক্রমে রাজনৈতিক দল আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু এক একটা নির্বাচন রাজনৈতিক দলের জন্যে হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দল অনেক বেশী সংগঠিত, অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং অনেক বেশি সমর্থিত হয়। এ দেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.pathagar.com

এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য এভাবে রাজনৈতিক দলের পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী হয়েছে। শুধু কি তাই? এ সমাজের রাজনৈতিক কৃষ্টিও রাজনৈতিক দলের জন্য সুখকর নয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক কৃষ্টি পরস্পরের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সমাজ জীবন প্রাণবন্ত থাকে এবং রাজনৈতিক দল এই "পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের" প্রতীক। দলের মতো ক্ষুদ্রতর সামাজিক এককে আস্থা এবং বিশ্বাসের যে কুঁড়ি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই কালে প্রস্ফুটিত হয়ে সমগ্র সমাজে বিশ্বাসের এক অনাবিল সৌরভ ছড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ সমাজের রাজনৈতিক কৃষ্টির বেশ কয়েকটি উপাদান কিন্তু এর পরিপন্থী। ব্যাপক উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে অপরের প্রতি ঈর্ষা এবং সমষ্টিগত প্রজ্ঞার পরিবর্তে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা–অনিচ্ছাকে সমষ্টিগত পর্যায়ে টেনে আনা এদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। উন্নত বিশ্বে রাজনীতি হলো সমস্যা সমাধানের মাধ্যম, কিন্তু এদেশে রাজনীতিকে নেয়া হয় ব্যক্তিগত প্রবৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে।

গণতান্ত্রিক বিশ্বে রাজনৈতিক নেতা হলেন প্রতিনিয়ত জনসেবায় রত একজন যোগাযোগকারী। এ দেশের রাজনৈতিক নেতা হলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পরম পরাক্রমশালী আদেশদানকারী, নয়তো ক্ষমতা দখলে প্রয়াসী বিভিন্ন কলাকৌশলে পারদর্শী। গণতান্ত্রিক বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলো সার্বিক কল্যাণের জন্য ব্যাপক দায়িত্ব। কিন্তু এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলো ব্যক্তিগত প্রবৃদ্ধির সিংহদ্বারে প্রবেশের সরল রাজপথ। এ দেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি তাই রাজনৈতিক দলের বিকাশে হাজারো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পারস্পরিক সন্দেহ এবং ঈর্ষার প্রভাবে দলে প্রথমে উপ–দলের সৃষ্টি হয় এবং পরে দলটিকে খণ্ডছিন্ন শতধা–বিভক্ত হতে দেখা যায়। সমষ্টিগত প্রজ্ঞার প্রতি ঔদাসীন্য এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতি আকর্ষণ কালক্রমে দলীয় সংগঠনকে দলীয় নেতার নিজস্ব পকেট সংগঠনে পরিণত করে। সমষ্টির প্রতি আনুগত্য ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের রূপ লাভ করে। এসবের জন্যে এদেশের রাজনৈতিক দল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সমন্বয় বিধানকারী এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলে যেভাবে বিগত চার দশকে ভাঙ্গন ধরেছে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় যেভাবে দল গঠিত হয়েছে তা এ দেশের সংকীর্ণ রাজনৈতিক কৃষ্টির পরিচায়ক।

রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হয় যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ। এর কারণ দ্বিবিধঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা লাভ করেন না। তাঁরা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগও করেন না। ১৯৮৫ সালের পূর্বে ও পরে এবং ১৯৭৫ সালের পূর্বে ও পরে এদেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যার দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সামরিক শাসনের প্রভাবও রাজনৈতিক দলের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। এর কারণ বহু। রাজনৈতিক দলের প্রতি জেনারেলদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই এবং সামরিক শাসনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলো রাজনৈতিক দল। শাসন ব্যবস্থার বৈধতার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেনারেলগণ রাজনৈতিক দল গঠন করেন বটে, কিন্তু কোন সময় তাঁরা রাজনৈতিক দলের

www.pathagar.com

মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। জেনারেল আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগ বা জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টির দিকে তাকালেই চলবে। এসব দল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহুদূরে অবস্থান করতো। অনেক সময় এসব দলকে সরকারের বি-টিম হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

সামরিক শাসনের শেষ পর্যায়ে যখন বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় – তখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অংশে আধিপত্য করেন সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ। এ পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, নির্বাচিত আইন পরিষদও কার্যকর থাকতে পারে, দলীয় নেতৃবর্গ মন্ত্রিপরিষদে স্থান লাভও করতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতার দুর্গ সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারাই সুরক্ষিত থাকে। এ ভাবে কালক্রমে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রটি বন্ধ্যাত্ব লাভ করে।

[গ]

এ দেশের রাজনৈতিক দলের অপরিণত কাঠামো এবং নৈতিক অবক্ষয়ের জন্যে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থাও কম দায়ী নয়। জন-সাধারণের সীমাহীন দারিদ্র্য, জাতীয় সম্পদের অপ্রতুলতা, বিভিন্ন গ্রুপ, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে তীব্র কোন্দল, সর্বোপরি সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এলিট থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত পোষক-আশ্রিত সম্পর্কের বিস্তৃত জাল (network of patron-client ties) বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্ম দিয়েছে। এসবের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্তরও নিম্নগামী হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছে খণ্ডছিন্ন ও ভঙ্গুর। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল কৃষি-ভিত্তিক সমাজে পোষক-আশ্রিত সম্পর্ক কোন না কোন আকারে সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ব্যাপক বৈদেশিক সহযোগিতার প্রভাবে দেশের অর্থনীতি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বৈদেশিক সাহায্য সহজলভ্য হয়েছে তার ফলে পোষক-আশ্রিত সম্পর্ক শুধু যে অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে তাই নয়, সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে সমাজের নিম্ন স্তর পর্যন্ত।

স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম্য মহাজন, ভূমি মালিক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং নিম্নস্তরের সরকারী কর্মকর্তা সাধারণ জনগণের পোষক। অন্যদিকে তারাই আবার কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের আশ্রিত। এভাবে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পোষক-আশ্রিত সম্পর্ক সমাজ জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, পোষক-আশ্রিত সম্পর্কের বিভিন্ন স্তরে সম্প্রতি প্রতিযোগিতা ও স্বার্থ সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে মারাত্মকভাবে। এর মূলে রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক এলিটদের স্বার্থ দ্বন্দ্ব আর এ ধরনের স্বার্থ দ্বন্দ্বের মূলে থাকে ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। যেহেতু ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ পদ আদর্শ এবং নীতির মাধ্যমে আজকাল আর আসছে না, তাই আগ্রহীরা সর্বত্র খুঁজে ফেরেন সমর্থক বা পোষক। সমর্থনভিত দৃঢ় করার লক্ষ্যে পোষকরাও খোঁজেন আশ্রিত। এভাবে কেন্দ্রের সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্ত পর্যন্ত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে হয়ে উঠছে সংঘাতময়। এ সংঘাতের প্রকাশ ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিভিন্ন উপদল গঠনে, সাংগঠনিক পর্যায়ে দলীয় ভাঙ্গনে, অথবা রাতরাতি দল গঠনে। এ অবস্থায় আর যাই থাক, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে

www.pathagar.com

কোনরূপ বস্তুনিষ্ঠতা, সার্বজনীনতা বা আইনানুগ পদ্ধতির কোন স্থান নেই। আনুগত্যের ভিত্তি হয়েছে সুযোগ–সুবিধা এবং সুযোগ–সুবিধার বিতরণ হচ্ছে পোষক–আশ্রিত সম্পর্কের ভিত্তি। ফলে কোন রাজনৈতিক দল, সরকারী হোক আর বেসরকারী হোক, আজ আর সামাজিক মূল্যের কর্তৃত্বব্যঞ্জক বিতরণকারী নয়, নয় সংঘাত নিরসনের মাধ্যম অথবা পৌর আনুগত্যের জ্যোতিকেন্দ্র।

[ঘ]

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের জন্ম–পরিবেশও অনেকাংশে তাদের প্রকৃতি এবং কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই তার সত্তা এবং আত্মিক রূপ নির্দিষ্ট করে দেয়। উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষ করে এ উপ–মহাদেশে, রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে অনেকটা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল তার কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল জন্ম লাভ করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী দু'টি রাজনৈতিক দলের জন্মের দিকে তাকালেই এর সত্যতা চোখে পড়বে। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে। লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইংরেজ সিভিলিয়ান আলেকজান্ডার হিউম। ১৮৮৫–১৯০৪ সময় কালে পাঁচ জন ইংরেজ সিভিলিয়ান কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইংরেজ শাসকদের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগেরও জন্ম হয়। লক্ষ্য নির্ধারণী ঘোষণায় বলা হয় "বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি" মুসলিম লীগের অন্যতম লক্ষ্য।

সাম্প্রতিককালেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং উদ্যোগে গঠিত হয়েছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল। ১৯৭৫ সালে গৃহীত চতুর্থ সংশোধনী আইনে পরিকল্পিত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, বাংলাদেশ কৃষক–শ্রমিক–আওয়ামী লীগ (বাকশাল), রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৯৮৬ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের উদ্যোগে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে সৃষ্ট রাজনৈতিক দলে ঐক্যসূত্র হিসেবে কাজ করে প্রধানত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ এবং নেতার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। তাই এ ধরনের দল কাঠামোগত উৎকর্ষ অর্জনে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। সরকারী দল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হলেও এ ধরনের দল বিরোধী দল হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে তার ঐক্যসূত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ছিন্ন হয়। দলীয় শৃংখলা বিপর্যস্ত হয়। দলীয় পর্যায়ে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। অতি অল্প সময়ে দল ভাঙ্গনের কবলে পতিত হয়।

অন্য আর এক দিক থেকে এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্ম–পরিবেশ ভিন্ন। উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে স্বতন্ত্রভাবে, সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে, জাতীয় কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে। তাই ঐসব দেশে সরকারী দলের অবস্থান

www.pathagar.com

বিরোধী দলের সমান্তরাল। নীতি, কর্মসূচী এবং নৈতিক মাত্রায় সব দলই সমান্তরালভাবে অগ্রসরমান। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতি, ক্ষমতা প্রয়োগের রীতি, ক্ষমতা ত্যাগের পরিস্থিতি সম্পর্কে সব দল ঐকমত্য পোষণ করে। সরকারী দলের থাকে কেবিনেট আর বিরোধী দলের থাকে ছায়া কেবিনেট। সরকারী দল ব্যর্থ হলে বিরোধী দল সে স্থান পূর্ণ করে। ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে অথবা ক্ষমতা ত্যাগের পর্যায়ে কোন বিপর্যয় ঘটে না।

উন্নয়নশীল দেশে কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের একাংশ থেকে। দলপতিরা এককালে সরকারী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরাই হন বিরোধী দলের নেতৃবর্গ। ফলে এসব দেশে সরকারী দল ও বিরোধী দলের অবস্থান মুখোমুখি এবং সম্পর্ক সংঘর্ষমূলক। নীতি ও কর্মসূচী পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে গভীর মিল। তফাৎ নেই দলীয় কলাকৌশলে বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণে। তফাৎ শুধু ক্ষমতা লাভের বা ক্ষমতা সংরক্ষণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার ব্যাপকতায় এবং গভীরতায়। এমনি সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতিতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর খুব কমই ঘটে।

এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের জন্ম পরিবেশের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের একাংশই আওয়ামী লীগের ভিত্তি পত্তন করে। আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসেই কিছু সংখ্যক নেতা ন্যাপ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রপতি আইয়ুবের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগের একাংশ কনভেনশন মুসলিম লীগে রূপান্তরিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টি এবং পিপলস্ পার্টির গঠন প্রক্রিয়াও অনুরূপ। ক্ষমতাসীন দলের একাংশ দ্বারা বিরোধী দল গঠিত হলে অথবা বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ক্ষমতা লাভ অথবা সংরক্ষণই দলীয় কার্যক্রমের প্রধান চলক–এ পরিণত হয়। ফলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংঘাতময় হয়ে ওঠে। নীতি–কর্মসূচী বা নৈতিক মান গুরুত্ব হারায়। দলীয় কার্যক্রম বস্তুনিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং জনসমষ্টির বৃহৎ অংশের নিকট তা তেমন অর্থপূর্ণ থাকে না।

[ঙ]

উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল থেকে আমাদের রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে স্বতন্ত্র। তবে ঐ সব সমাজে রাজনৈতিক দলকে যে ভূমিকা পালন করতে হয় আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের উপরও সেই দায়িত্ব ন্যস্ত। গণতন্ত্র এদেশী কোন ব্যবস্থা নয়। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক পরিবেশে গণতন্ত্রের জন্ম। মূলত রাজনীতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো গণতন্ত্র। বিদেশী হলেও এদেশেও আমরা কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছি গণতন্ত্রকে। তাই উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক দল থেকে স্বতন্ত্র হলেও আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে হাজারো পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরী হতে হবে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্যে।

পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ভূমিকা যথার্থরূপে পালনে সক্ষম হয় কয়েকটি অঙ্গীকারের ভিত্তিতে। এদেশেও তা অনুকরণযোগ্য। ঐসব দেশে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংহত হয় এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো গণতান্ত্রিক নীতিতে শুধু যে আস্থা স্থাপন করে তাই নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলীয়

www.pathagar.com

কাঠামো ও নীতি সুবিন্যস্ত করে। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দলকে এভাবে সংহত হতে হবে। নিজস্ব সংগঠনে গণতন্ত্র চর্চা না করে কোন নেতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখলে তার যে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা এ দেশে বহুবার দেখা গেছে।

পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মসূচী প্রণয়নে এ অঙ্গীকার সুস্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা–অনিচ্ছা বা ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধির উর্ধে রয়েছে সমষ্টিগত প্রজ্ঞা। ফলে দলীয় কার্যক্রমে কোন সময় কোন ব্যক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। দলও কোন নেতার নিজস্ব সংগঠনে পরিণত হয় না। সম্মোহনী নেতার (charismatic leader) অবশ্য কোন বিকল্প নেই। কোন কোন সময় এমন এক সিংহপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যাঁর নিকট সবাই অবনতমস্তক হয়। কিন্তু সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল হলো দলের, কোন নেতার নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ অঙ্গীকার আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি ও কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে মণিকাঞ্চন স্বরূপ। সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে ভিন্নমতের অবকাশ আছে। তাই পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক দলের প্রথম পাঠ হলো ভিন্নমত প্রকাশের স্বীকৃত নীতি ("They have to agree first of all to disagree")। ফলে হাজারো ভিন্নমতের অরণ্যে কেউ পথ হারায় না। পাশ্চাত্যে দলত্যাগ এক সামাজিক বিচ্যুতি। যিনি দলত্যাগ করলেন তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ দেশে কিন্তু দল ত্যাগ করে তিনি নতুন দল গঠন করেন। যেহেতু দলত্যাগ সামাজিক বিচ্যুতি, তাই এর বিচার হয় সমাজে। রাজনীতির অঙ্গনে তিনি হন পরিত্যক্ত। এদেশে সেই মূল্যবোধের মূল দৃঢ় নয়।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এ দেশে অনুকরণযোগ্য। তা হলো জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকল দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতি, ক্ষমতা প্রয়োগ রীতি, ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয়ে সকল দলের মধ্যে গড়ে ওঠে ঐকমত্য। কোন্ দল কোন্ পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে অথবা কোন্ দল কখন ক্ষমতা পরিত্যাগ করবে এ সব বিষয়ে কারো কোন দ্বিধা থাকে না। তা ছাড়া, জাতীয় প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, এমন কি শিক্ষা–সংস্কৃতি বিষয়েও থাকে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সহমত। এদেশের দলগুলো দুর্ভাগ্যবশত এখনও এ সব বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি।

সংক্ষেপে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির নাট্যমঞ্চে রাজনৈতিক দলই থাকে নাম ভূমিকায়। নায়কের সঠিক অভিনয় যেমন নাটকের প্রতিটি অংককে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিটি স্তর তেমনি কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের সুসংহত জাতীয় কর্মসূচী এবং নৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্যা

[এক]

গণতন্ত্রের প্রতি এ জাতির দুর্বলতা :

উপমহাদেশের এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আদর্শ বরাবর ছিল জনগণের প্রেরণার উৎস। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল জনগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। বৃটিশ ভারতে বাঙ্গালীরাই ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফ্রন্ট লাইনে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এক অর্থে ছিল বাঙ্গালীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। দ্বিতীয় দশকের পর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব বাংলার বাইরে যায়।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার গণতান্ত্রিক সুরের জন্য। এ প্রস্তাবের মর্মবাণী একদিকে যেমন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অন্যদিকে তেমনি স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। তার পর থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার সঠিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যে সব আন্দোলন দানা বাঁধে তাদের প্রত্যেকটির মূল প্রোথিত ছিল গণতান্ত্রিক চেতনায়।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত বিরোধী দলগুলোর যে সম্মিলিত মোর্চা গঠিত হয় ১৯৫৪ সালে, সেই যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক একুশ দফার সাতটি দফাই (দফা, ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৫, ২০, ২১) ছিল পূর্ব বাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যকারিতা সম্পর্কিত। ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে বাঙালীদের জাতীয় আন্দোলনে রূপলাভ করে। ছয় দফা কর্মসূচীর প্রথম দফা ছিল এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের রূপ রেখা সম্পর্কে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রাধান্য এবং জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলকে প্রত্যাখ্যানই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোয় গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ এ জাতিকে সঞ্জীবিত রাখে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এক রক্তের নদী সাঁতার দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তুলে আনে স্বাধীনতার লাল গোলাপ।

রক্তাক্ত স্বাধীন বাংলায় যা আশা করা গিয়েছিল তাই হোল। নতুন রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নেই জনগণ লাভ করে গণতান্ত্রিক সংবিধান। ১৯৭২-এর সাময়িক সংবিধান আদেশে (Provisional Constitution Order 1972) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭২-এর সংবিধানে সে ধারা অব্যাহত রইলো। ১৯৭২-এর সংবিধানের মূল সুর সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ এ সংবিধানের মৌল বক্তব্য।

www.pathagar.com

মনে হয়েছে, বাঙ্গালীদের এতদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ হোল। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন টিকেনি। মাত্র ক' বছরের মধ্যে সে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা এক পা দু'পা করে কর্তৃত্ববাদী স্বৈরশাসনের অতলে তলিয়ে গেল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বহুদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয় একদলীয় ব্যবস্থা। তারও কিছুদিন পর, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টে সামরিক বাহিনীর কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তার নেতৃত্বে রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অধ্যায় এভাবে সমাপ্ত হয়েছে। গণতন্ত্র কি এ অঞ্চলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আদর্শ? গণতন্ত্র বিকাশের সব পথ কি এখানে রুদ্ধ? বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? এই সংক্ষিপ্ত রচনায় এসব প্রশ্নের কিছুটা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[দুই]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মৌল অঙ্গীকার ঃ

পাশ্চাত্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্র দু'টি মৌল অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কার্যকর রয়েছে। সরকার যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তা ন্যাসী কর্তৃত্ব (Trust)। সমাজের পক্ষে এবং সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় সরকার এ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। সরকার যদি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় অথবা সমাজ যদি মনে করে সরকার অনুমোদিত পন্থায় সে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেনি বা প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে তাহলে সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে। অন্য রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনে সন্ত্রাস বা বল প্রয়োগের কোন স্থান নেই।

অন্য কথায়, গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকৃতি, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ পদ্ধতি, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োগকারী, কর্তৃত্ব প্রয়োগে ব্যর্থতার নিদর্শন এবং ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক ধরনের ঐকমত্য রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐকমত্যের পরিচয় মেলে প্রথায় বা কনভেনশনে, কোথাও বা তা সংবিধানে বিধিবদ্ধ রয়েছে। সর্বক্ষেত্রে এ ঐকমত্য সর্বজনবিদিত। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বত্র ঐকমত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন হলো আইনের শাসন। কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের শাসন নয়। এ ক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্যই মূল কথা। আইনের প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পন্ন হয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক, সংসদে। প্রণীত আইন মেনে চলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। কোন আইন মন্দ হলেও তা মেনে চলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিবর্তিত না হচ্ছে।

অন্য কথায়, আইন সমাজে সবকিছুর নিয়ামক। সমাজে সকল শ্রেণী ও গ্রুপের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আইন। পুরস্কার বা বঞ্চনা, পদোন্নতি বা পদচ্যুতি, লাভ বা লোকসান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক আইন। ব্যক্তি তা তিনি যত উঁচু পদে থাকুন না কেন, কাউকে কিছু দিতে অক্ষম বা কারো কোন ক্ষতি সাধনেও অক্ষম। মোট কথা, গণতান্ত্রিক সমাজে শাসন হলো আইনের শাসন। এ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হলে আইনের আশ্রয় লাভ করে তিনি তার প্রতিবিধান করতে পারেন। কোন প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলে তিনি আইনের সাহায্য লাভ করতে পারেন।

www.pathagar.com

দু'টি মৌল অঙ্গীকার ছাড়াও অন্য দু'টি কারণে পাশ্চাত্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠেছে। এখানে সামাজিক উপত্যকা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে জারিত। সামাজিক উপত্যকা মোটামুটিভাবে সমতল। পীড়নমূলক স্তর বিন্যাসে সমাজ জীবন তেমন অতিষ্ঠ নয়। এ ক্ষেত্রে এক ধরনের সাম্য সবার চোখে পড়ে যার ফলে একজন অন্যকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করে, একজন অন্যের মতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে যদিও তা তাঁর মত থেকে ভিন্ন। একজন অন্যের কাজকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

এসব সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে বিন্যস্ত যে সমাজের সকল শ্রেণী বা গ্রুপ জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। ধনী-নির্ধন, বড়-ছোটর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন সম্পর্কে জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ নিশ্চিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজে কাউকে মানবেতর জীবনে বাধ্য হতে হয় না।

এদিক থেকে বলা যায়, গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলে যে সব শর্ত অপরিহার্য তার অধিকাংশই সামাজিক। প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে প্রথমে সামাজিক ব্যবস্থা রূপে। বহুদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সমাজ থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বে এবং বাংলাদেশে বিশেষ করে, গণতন্ত্রের প্রয়োগ হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যদিও এ সমাজে বিদ্যমান রয়েছে অসহনীয় অসাম্য, নির্মম বঞ্চনা, ব্যক্তি এবং শ্রেণীর মধ্যে অসম ব্যবধান, উঁচু-নীচুর মধ্যে অসহনীয় পার্থক্য। বাংলাদেশ সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ এখনও ঘটেনি। এ সমাজে এখনও সূচিত হয়নি আইনের প্রতি আনুগত্য। কোন কিছু পেতে হলে এখনও ব্যক্তি ব্যক্তির দিকে তাকায়, আইনের দিকে নয়। ফলে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরেও স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও গণতন্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সংকটের জন্ম হয়। নেতৃত্ব হারায় গতি, সমাজ জীবন হয়ে ওঠে পীড়নমূলক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয় ক্ষমতালিপ্সু

[তিন]

নেতৃত্বের সংকট

বাংলাদেশের শাসনকারী এলিটরা রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে কোন দিন ন্যাসী কর্তৃত্ব (Trust) রূপে গ্রহণ করে নি। নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল সীমাহীন সুযোগ-সুবিধার উৎস স্বরূপ। প্রভাব-প্রতিপত্তি-বৈভব অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। ক্ষমতায় একবার এলে নেতৃবৃন্দ কোন সময় তা হাতছাড়া করতে চাননি।

বাংলাদেশের ভাগ্য একদিক থেকে অত্যন্ত প্রসন্ন। আবুল কাশেম ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের মত বহু ক্ষণজন্মা মহান নেতা এ মাটির সন্তান। ত্যাগ-তিতিক্ষা, নৈপুণ্য-দক্ষতার যে কোন মানদণ্ডে তাঁদের কোন তুলনা নেই। কিন্তু যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন

www.pathagar.com

তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কোন সময় ন্যাসী ক্ষমতা হিসেবে দেখেননি। ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েও তাঁরা বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর অন্য কোন রাজনৈতিক দলের দিকে তাকাননি।

গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং শাসনকারী এলিটরা কোন সময় সবজান্তার ভূমিকা পালন করেন না। তাঁরা সব সময় নিজেদের এবং দলের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন। শ্রদ্ধাশীল হন বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি। যখন তাঁরা নিজেদের ব্যর্থতা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেন অথবা সংবাদপত্র এবং বিরোধী দলের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যখন সে ব্যর্থতা তুলে ধরে তখন বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীকে সুযোগদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। বিকল্প নেতৃত্বের জন্য স্বেচ্ছায় সুযোগ সৃষ্টি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। বিকল্প নেতৃত্বকে সুযোগদানের জন্য বাংলাদেশে কোন মন্ত্রী বা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি।

তাছাড়া, বাংলাদেশে খুব কম রাজনৈতিক নেতাকে বিরোধী দলের প্রতি, বিরোধী দলের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে দেখা গেছে। সরকারের বিরোধিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এমন কি বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গের দেশপ্রেমের প্রতিও সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশী রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, এখানে বিরোধিতা সহ্য করা হয় না। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে অত্যাচারিত হয়েও যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তিনিও বিরোধিতা সহ্য করেননি। সংবাদপত্রের ভূমিকা এ দেশে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা সংবাদপত্রকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। ছোটখাট অভিযোগে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। জনমতের অন্যান্য মাধ্যমগুলোও ষড়যন্ত্রমূলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ক্ষমতাসীন দল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সরকারে অধিষ্ঠিত দল সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধীদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে উদ্যত হয়। তাদের মূল্যবান সময় এবং সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়োজিত হয় বিরোধীদলের অতীতকে কালিমা লিপ্ত করতে। তাদের বর্তমানকে বিশৃংখলার আবরণে আচ্ছাদিত করতে। শুধু তাই নয়, সরকার তখন সরকারী ব্যয় ও শ্রমে নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ করার জন্য সরকারী অর্থ ও প্রয়াসের অপব্যয়ে লিপ্ত হয়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমকে দলীয় মাধ্যমে রূপান্তরিত করে।

সরকারের এ মনোভাব সমগ্র সমাজব্যাপী সৃষ্টি করে এক অসহনীয় অবস্থা। কোন গত্যন্তর না দেখে বিরোধীদল প্রতিবাদের নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিত্যাগ করে নেমে আসে রাজপথে। ফলে নেমে আসে হাজারো ধারায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সামাজিক জীবন হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। জ্বালাও-পোড়াও মনোভাব শক্তিশালী হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়। এমনকি অকালে ঝরে যায় অনেক অনেক অমূল্য প্রাণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থা শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। তখন বাধ্য হয়ে স্বৈরাচার নেমে আসে পথে এবং হারিয়ে যায় ইতিহাসের অন্ধকার গলিতে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাস এমনি করুণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান হয় সংসদে অথবা মন্ত্রিপরিষদে বা দলীয় কার্যালয়ে, রাজপথে নয়। গণতন্ত্রে সমস্যার সমাধান হয়

www.pathagar.com

যুক্তিবাদী আলোচনা–পর্যালোচনার মাধ্যমে, উন্নত বিতর্ক বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে, ঘেরাও, জ্বালাও–পোড়াও বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়।

বলা হয়ে থাকে, তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় কারণ জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকেও এ ধরনের অভিযোগ দেখা যাবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী জনগণ নয়। এজন্য দায়ী মূলতঃ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং শাসনকারী এলিটরা। তাঁরা গণতন্ত্র সচেতন নন। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে সব শর্তাবলী প্রয়োজন সে সম্পর্কে নেতৃবর্গ পুরোপুরি সচেতন নন। অনেক ক্ষেত্রে দলীয় পর্যায়েও তাঁরা গণতন্ত্র চর্চা করেন না। গণতন্ত্রকে সার্থক করার জন্য বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে তা দেখা যায় না।

[চার]

সামাজিক সংকট

গণতন্ত্র এমন এক সমাজে বিকাশ লাভ করে যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগ–সুবিধার সুষম বন্টন সম্পন্ন হয়েছে। অভুক্ত, বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত, গৃহহীন, চরম দারিদ্র্যে নিপতিত জনগণের নিকট গণতন্ত্র অর্থহীন। সমাজে ধনী–নির্ধনের মধ্যে ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য জনসমষ্টির সংখ্যা যে সমাজে উল্লেখযোগ্য ঐ সমাজে গণতন্ত্র এক রাজনৈতিক আদর্শ মাত্র। বঞ্চিত এবং অসহায়দের এক রঙিন স্বপ্ন। গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো চরম দারিদ্রের অনুপস্থিতি। অর্থনৈতিক সুযোগ–সুবিধার সুষম বন্টনের মাধ্যমেই শুধু সর্বশ্রেণীর জনগণকে জাতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপে জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতির উপর, নেতৃত্বের বৈধতা এবং নেতাদের শ্রেণী চরিত্রের উপর।

রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং শাসনকারী এলিটদের শাসন ক্ষমতার বৈধতা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন অথবা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। গণতন্ত্রের বিকাশে তারা কিছুই করতে পারেন না। গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিবর্গের আস্থা তারা কোনদিন অর্জনে সক্ষম হন না। যারা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসেননি গণতন্ত্রের জন্য তাদের মায়াকান্না সমাজে কোন সাড়া জাগায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে জনসমর্থন লাভ করলেও তাদের সামনে বড় বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফণা উদ্যত করে থাকে। ক্ষমতা লাভে যে কোন ধরনের অনিয়ম সারাক্ষণ তাদের তাড়া করে ফেরে। দীর্ঘ সাড়ে আট বছর ধরে জেনারেল এরশাদ তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।

সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় ক্ষমতাসীন হয়ে যেমন গণতন্ত্র বিকাশে কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়, তেমনি গণবিচ্ছিন্ন এবং সাধারণ মানুষ থেকে দূরত্বে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গেরও এক্ষেত্রে কোন অর্থপূর্ণ অবদান থাকে না। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এখানকার

www.pathagar.com

শাসনকারী এলিটদের অধিকাংশই জনগণের আপনজন নয়। রাজনৈতিক নেতাই হোন আর প্রশাসনিক কর্মকর্তাই হোন, যারা এতদিন শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেছেন তারা সামজের এক সংকীর্ণ গোষ্ঠী (exclusive group)। জনগণ থেকে বহু দূরে তাদের অবস্থান। সম্পদ, পদমর্যাদা, সুযোগ–সুবিধার যে কোন মানদণ্ডে তারা জনগণের কাছের মানুষ নন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবন পদ্ধতি, চিন্তাচেতনা, অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। এক অর্থে, এদেশে রাজনীতির খেলাটি এই সংকীর্ণ জনসমষ্টির মধ্যেই সীমিত। জনগণের দোহাই দিয়ে তারা ক্ষমতায় আসেন বটে, কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে লক্ষ্য অর্জনে প্রয়াসী হন তা হয়ে ওঠে গণস্বার্থের পরিপন্থী। জনগণের নামে তারা ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তাদের আকর্ষণ দুর্নিবার। রাজনৈতিক ক্ষমতা একবার লাভ করলে ক্ষমতার সংরক্ষণই তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিগুলোকে তখন তারা ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্যে দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন।

যেহেতু শাসনকারী এলিটরা সমাজের সংকীর্ণ গোষ্ঠীভুক্ত, দল ও মতের বিভিন্নতার কারণে তাদের মধ্যে কোন কোন সময় দ্বন্দ্বও দেখা দেয়। ক্ষমতা লিপ্সা তখন মিলন সূত্র হিসেবে কাজ করে। কাজ চালানো গোছের ঐক্য গড়ে উঠতে বিলম্ব হয় না। ফলে দেখা যায়, কদিন আগেও যিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন মন্ত্রী হবার ডাক পেলে দলত্যাগ করে অবিলম্বে তিনি ছুটে আসেন। কেউ কেউ দিনের বেলা সরকার বিরোধী অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিচ্ছেন, সন্ধ্যা হলে তারাই ছুটেন বঙ্গভবন। ক্ষমতাই যখন প্রধান লক্ষ্য তখন কপটতা, ভণ্ডামী, ষড়যন্ত্র সবই গ্রহণযোগ্য! সব কিছুই চলে সীমাহীন চতুরতার সাথে, সমান তালে।

সবচেয়ে যা দুঃখজনক তা হোল, জনগণের নামে আন্দোলন পরিচালনা করেও জনগণকে জাতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সম্পৃক্ত করার সার্থক উদ্যোগ এখন পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এদেশের রাজনীতি এখনও সংকীর্ণ এক জনসমষ্টির নিয়ন্ত্রণে। পরিচালিতও হচ্ছে জনসমষ্টির ক্ষুদ্রতম এক অংশের জন্য। এর ফসলও মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ঘরে উঠছে।

বাংলাদেশে রাজনীতিকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করতে যা প্রয়োজন তা হলো জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশকে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা। এ জন্য প্রয়োজন দু'টি পদক্ষেপঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপক ব্যাপ্তি এবং জাতীয় সম্পদের সুষম বৃদ্ধি ও বন্টন।

রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা। জনগণকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে হলে প্রয়োজন হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাকে সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে বহুসংখ্যক গণমুখী প্রতিষ্ঠান রচনার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। ঐ সব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে প্রাতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করবে। নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে। এদেশে রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবার একমাত্র পন্থা জনগণকে হাজারো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

www.pathagar.com

সংহত করা। ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান মুখ্য হয়ে না উঠলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কোনদিন স্থিতিশীল হবে না।

জাতীয় সম্পদের পূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজের বঞ্চিতদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি অবহেলিতদের জন্য অধিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। মোটকথা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার চেতনার পরিপোষণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ত অনুভূত হবে বহুদিন, কিন্তু নিজেদের সৃষ্টিশীল উদ্যমের কণ্ঠরোধ না করে এবং তার অপচয় না ঘটিয়ে যেন তার আগমন ঘটে তা দেখতে হবে। সর্বোপরি দেখতে হবে, প্রাপ্য সাহায্যের পূর্ণ বিনিয়োগ সম্পন্ন হচ্ছে। শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোন সমাজ অগ্রগতি সাধন করেনি। ইতিহাস তার সাক্ষী।

প্রয়োজনবোধে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপরেখার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত ও অবহেলিতদের জন্য অধিক সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রচলিত প্রক্রিয়া, কেন্দ্র থেকে প্রান্তের (Centre to Periphery) পরিবর্তে উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রান্ত থেকে কেন্দ্র (Periphery to Centre) প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে হবে যেন দেশের প্রান্তিক অঞ্চল এবং প্রান্তিক জনসমষ্টির উন্নতির জন্য সম্পদের যথার্থ বরাদ্দ সম্ভব হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সমাজে গণশিক্ষার উপর গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা একদিকে যেমন জনগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে অন্যদিকে তেমনি জাগ্রত করে আত্মসম্মানবোধ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক অর্থে আত্মসম্মান সম্পন্ন এবং আত্মসচেতন ব্যক্তিবর্গের শাসন ব্যবস্থা। গণশিক্ষার অভাবে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি রাজনীতির ধারে কাছেও নেই। অন্যদিকে ক্ষমতার আকর্ষণে এতদিন রাজনীতি রয়ে গেছে সংকীর্ণ এক জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশের রাজনীতি যেন সেই রূপকথার অন্ধকার কুঠরীতে বন্দিনী রাজকন্যা। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজনে রাজনীতিকে এতদিন ব্যবহার করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে, শুধুমাত্র ক্ষমতা এবং ক্ষমতালব্ধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য। গণতন্ত্রের কথা বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্র অবাধে রাজত্ব করেছে। একনায়কের সামনে মন্ত্রীদের আচরণ ও কার্যক্রম শুধুমাত্র অসম্মানজনক ছিল না, তা ছিল ভয়ঙ্কর রকম লজ্জাজনক। এরশাদ সরকারের আমলে যে কোন সভা সমিতির কথা মনে করলেই চলবে। রাষ্ট্রপতির সামনে থাকতো জনগণ কিন্তু মন্ত্রীদের সামনে ছিল স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। উপস্থিত মন্ত্রীরা নির্লজ্জভাবে, প্রতিযোগিতা করে রাষ্ট্রপতির প্রশস্তি গাইত।

মোটকথা, গণতন্ত্র সীমিত সরকার ব্যবস্থা। সরকারের সীমারেখা নির্ধারণ করে সংবিধান এবং সংসদ প্রবর্তিত বিধি-বিধান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের অধিকার এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায় সার্থক হয় সজ্ঞান প্রচেষ্টায়, জনগণ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যকারিতায় এবং সফল নেতৃত্বের স্পর্শে।

www.pathagar.com

[পাঁচ]

রাজনৈতিক দল এবং সামরিক বাহিনী ঃ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে প্রধানতঃ একটি রাজনৈতিক দল শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। অন্যান্য দল বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে পথ নির্দেশ করে। ক্ষমতাসীন দলের নীতি ও কর্মসূচী জনগণের আস্থালাভে ব্যর্থ হলে বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দলীয় নীতি এবং কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক বাছাই-এর নাম নির্বাচন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মসূচীর নিয়ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রাণবন্ত থাকে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের অবস্থা অবশ্য অত্যন্ত করুণ। যদিও এখানে শতাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে, দলীয় ব্যবস্থা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। অনেক রাজনৈতিক দলের নেই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী। কোন কোন ক্ষেত্রে দলীয় সংগঠন অত্যন্ত আলগা। কোথাও-বা রাজনৈতিক দল নেতাকেন্দ্রিক কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত সুসংহত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা মাত্র ক'টি।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের করুণ অবস্থার যথার্থ কারণও রয়েছে। এ জন্য দায়ী একদিকে যেমন বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, অন্যদিকে তেমনি আর্থ-সামাজিক কাঠামো। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল কোন সময়ই সরকারী নীতি নির্ধারণ বা বিকল্প নীতি প্রণয়নের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়নি। তাছাড়া, রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম খুব কম সময়ই ছিল অবাধ, কেননা এ অঞ্চলে রাজনীতির প্রবাহ কোনদিনই অবাধ ছিল না। রাজনীতির প্রবাহ বারে বারে বাধাগ্রস্ত হয়েছে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কঠোর শিলায়।

এ দেশে যে সব রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের কয়েকটি জন্ম লাভ করে বৃটিশ শাসনামলে আর অধিকাংশের জন্ম হয় পাকিস্তান আমলে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক দলের সামনে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের মত সাধারণ শত্রু। শত্রুর উৎখাতই ছিল রাজনৈতিক কার্যক্রমের অভীষ্ট লক্ষ্য। জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ বা জাতীয় সংহতি অর্জনের মত ইতিবাচক পদক্ষেপ কোন সময় রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল না।

ঔপনিবেশিক আমলে দলীয় কাঠামো ছিল অপরিণত। দলীয় কার্যক্রম ছিল অনেক সময়ই বে-আইনী অথবা অতি সীমিত। বহু রাজনৈতিক দলকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে। ফলে দলীয় নীতির প্রচার বা দলীয় কর্মসূচীকে জনগণের নিকট উপস্থাপন করে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের উদ্যোগ তেমন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এসব কারণে এদেশে রাজনৈতিক দলের সুষম অগ্রগতি সাধিত হয়নি। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশের শাসনকারী এলিটরা রাজনৈতিক দলের অবাধ কার্যক্রমকে ভালভাবে গ্রহণ করেননি। ফলে বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের তুলনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি এখনও রয়েছে কাঠামোগতভাবে অপরিণত। কার্যক্রমের দিক থেকে অনভিজ্ঞ ও ষড়যন্ত্র প্রবণ।

www.pathagar.com

তাছাড়া, উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ লাভ করেছে এমন এক রাজনৈতিক ঐতিহ্য যেখানে গণ আন্দোলন এবং নির্বাচন একই সূত্রে গ্রথিত। গত চার দশকে এ অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে বহু রাজনৈতিক আন্দোলন। আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন উঠে আসে কতকগুলো রাজনৈতিক ইস্যু, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি হয় বিশেষ রাজনৈতিক শক্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এক রাশি নীতি এবং কর্মসূচীর মধ্য থেকে কিছু নীতি ও কর্মসূচীর এবং ঐ সকল নীতি ও কর্মসূচীর ধারক দলকে বাছাই করার জন্যে। এদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে বিজয়ী রাজনৈতিক ইস্যুকে অনুমোদন দানের জন্য, বিকল্প এক রাশি কর্মসূচীর মধ্য থেকে একটি বা কয়েকটিকে বাছাই করার জন্যে নয়। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এভাবে রাজনৈতিক দলের পূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এজন্য কম দায়ী নয়। জনসাধারণের সীমাহীন দারিদ্র, জাতীয় সম্পদের অপ্রতুলতা, বিভিন্ন গ্রুপ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে তীব্র কোন্দল, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত পোষক-আশ্রিত সম্পর্কের বিস্তৃত জাল (Network of Patron-Client Ties) শুধু যে বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্ম দিয়েছে তাই নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে করেছে খণ্ডচ্ছিন্ন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্তরকে করেছে নিম্নগামী। এ অবস্থায় রাজনৈতিক দল সংঘাত নিরসনের মাধ্যমও নয়, নয় রাজনৈতিক আনুগত্যের জ্যোতিকেন্দ্র।

রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য হ্রাস পাবার কারণেই ব্যক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ঐ সব ব্যক্তির, যারা পোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আশ্রিতদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। একই কারণে প্রতিষ্ঠিত দলগুলো তাদের সকল সমর্থককে দলে ধরে রাখতে পারেনি, কেননা তারাই নিজেদের কনস্টিটুয়েন্সিতে পোষক হবার আকাঙ্ক্ষায় দল ত্যাগ করে সরকারের আশ্রিত হয়েছেন। এরশাদ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের দিকে তাকালে দেখা যাবে কিভাবে এরশাদ সরকারের এক সময়ের কট্টর সমালোচকরা রাতারাতি দল ত্যাগ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। মোটকথা, বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক দলের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।

দেশে রাজনৈতিক দলের অবস্থা অসংহত হলেও দেশের প্রশাসনিক সেক্টর, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী, কিন্তু সুসংহত। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কেও সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সচেতন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, স্বাধীনতার পর সামরিক কর্মকর্তারা প্রায় বার বছর এ দেশের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন। আরও দু'বছর কেটেছে সামরিক আইনের ছায়ায়। সামরিক কর্মকর্তারা দীর্ঘকাল ধরে এদেশে শাসনকারী এলিটের ভূমিকায় শুধু সন্তুষ্ট হননি, আশির দশকের প্রথম দিকে তাদের দাবী ছিল, এদেশের শাসন ব্যবস্থায় তাদের এক সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত।

১৯৭৫ সাল থেকে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার সূচনা। ঐ বছর ১৫ই আগস্টে দুই ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় কয়েকজন নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা সরকার

www.pathagar.com

প্রধান মুজিবর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সে অভ্যুত্থানের পর থেকে চলে একটার পর একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে আর একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে দেশের আর একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান নিহত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতাসীন হন। রক্তক্ষয়ী এক গণ আন্দোলনে মাত্র সেদিন, ৬ই ডিসেম্বর, জেনারেল এরশাদের পতন হোল। সংক্ষেপে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী একদিকে যেমন সুসংহত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে তেমনি তা রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা–সচেতনতার কারণ সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের মত উপনিবেশ–উত্তর রাষ্ট্রে (Post-Colonial State) সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা সচেতনতার মূল নিহিত রয়েছে বৃটিশ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাঠামোয়। পাশ্চাত্যে রাজনীতি নিরপেক্ষ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠিত হয়। এ সংস্থার লক্ষ্য দেশের নিরাপত্তা বিধান, সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা। বৃটিশ ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু সংগঠিত হয় দেশের অভ্যন্তরে আইন–শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে। মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণ। ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হয়ে ওঠে ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী এবং সর্বতোভাবে রাজনৈতিক। বৃটিশ ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার উত্তরসুরি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এভাবে বৃটিশ ভারতীয় ব্যবস্থার উত্তরাধিকার লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষা–প্রশিক্ষণে, নিয়োগ এবং কার্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়। কিন্তু পাকিস্তানে বৃটিশ ভারতীয় ঐতিহ্য সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমী, পাকিস্তান এয়ারফোর্স একাডেমী হয়ে ওঠে স্যান্ধার্স্টের (Sandhurst) নব্য সংস্করণ। একই শ্রেণী থেকে নিয়োগ দান, একই প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ, একই পন্থায় সামাজিকীকরণ, একই ধরনে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান পাকিস্তানে অব্যাহত থাকে। ফলে দেখা যায়, মাত্র দশ বছরের মাথায় পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। অবিভক্ত পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত সামরিক কর্মকর্তাগণই রইলেন শাসন ব্যবস্থায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

পাকিস্তান সামরিক ব্যবস্থার উত্তরাধিকার লাভ করে বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাগণও হয়ে ওঠেন রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতন। অতীতে যে সব সামরিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে তারা সবাই নিয়োগ লাভ করেন পাকিস্তান আমলে। পাকিস্তানের সামরিক আইনের ছায়ায় তারা সবাই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ অবলোকন করেন।

পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার যে অশুভ প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে তাও এসব কর্মকর্তার চিন্তাভাবনা প্রভাবিত করে। পাকিস্তান বাহিনীতে বাঙ্গালী কর্মকর্তাদের অসুবিধাজনক অবস্থার জন্যও তাদের প্রতিবাদমুখর হতে হয়। এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হয় তাদের। ষাটের দশকে পাকিস্তানে যখন প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের প্রভাব আকাশচুম্বি হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালী প্রশাসক ও সামরিক কর্মকর্তারাই তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্রে পরিণত হন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই তার প্রমাণ।

১৯৭১–এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙ্গালী জোয়ান এবং কর্মকর্তারা পেশাগত শৃংখলা পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজনৈতিক দল ও জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ১১–১৭ জুলাই সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত সামরিক নেতৃবর্গের অধিবেশনে গেরিলা যুদ্ধের যে কৌশল উদ্ভাবন করা হয় তার ফলেও সামরিক বাহিনীকে জনগণের মাঝে মিশে গিয়ে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এক রক্তের নদী সাঁতরে সকলকে যেভাবে স্বাধীনতার লাল গোলাপ ছিনিয়ে আনতে হয় তাতে বাংলাদেশ সামরিক কর্মকর্তাদের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন না হবার কোন কারণ নেই। তাই দেখা গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী হয়ে উঠেছে ভয়ংকরভাবে রাজনীতি সচেতন (Over Politicized)।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট দেখা দিয়েছে নেতৃত্বের প্রকোষ্ঠে এবং সামাজিক উপত্যকায়। এ সমাজে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এর কোন বিকল্প নেই। অতীতে গণতন্ত্র আহত হয়েছে নেতৃবর্গের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমে, জনগণের দ্বারা নয়। এ সমাজে গণতন্ত্রের মূলকে সুদৃঢ় করতে হলে সামাজিক ক্ষেত্রকে পুরোপুরি গণতন্ত্রের উপযোগী করতে হবে। সমতল এবং উর্বর উপত্যকায় সোনালী ফসল ফলে, কিন্তু অসমতল ও উষর ক্ষেত্রে ফলে ক্যাক্টাস। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনগণের সমর্থনপুষ্ট, সুসংহত, সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচী ভিত্তিক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। সর্বশেষে, বাংলাদেশের মত উপনিবেশ–উত্তর রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বাহিনীর মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানেও পেশাদারী এবং রাজনীতি নিরপেক্ষ চেতনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পতাকা সমুন্নত রাখতে পারে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক ঃ নির্ভরশীল ও দলছুট প্রবণতা

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের বঙ্গভবনের শেষ দিনগুলো (At Bangabhabon : Last Phase) বিভিন্ন কারণে এক গুরুত্বপূর্ণ আলেখ্য। এতে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের সম্পর্কে যা লিখেছেন তা একদিকে যেমন সুস্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি হাতশাব্যঞ্জক এবং করুণ। কথাগুলো নতুন নয়, কোন গবেষণার ফলও নয়। কারো উদ্দেশেও বলা হয়নি। নিজের হতাশা ও ব্যথা নিয়ে একজন অরাজনৈতিক রাষ্ট্রপতি খুব সম্ভব তাঁর ব্যথার গ্লানি ভুলতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের সম্পর্কে কিছু সত্য ভাষণ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য যাই থাক, বিচারপতি সায়েমের এ অনুভূতি এদেশের গণমনে নতুন ভাবনার উদ্রেক করুক এ প্রত্যাশা সকলের। এ দেশের রাজনীতিকে প্রাণবন্ত, যুগোপযোগী, সমাধানমূলক, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করার উদ্যোগে এসব সত্য ভাষণ কি কোনই কাজে লাগবে না?

এদেশে তাঁর কথায়, "রাজনীতি ও রাজনৈতিক পদের মত অনায়াসলব্ধ আর কিছু নেই। এসবের জন্য কোন ধরনের প্রস্তুতির দরকার নেই, কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন এতটুকু বুদ্ধিবৃত্তির"। রাজনীতি ও প্রশাসনে তাই তিনি অদক্ষতা, নৈপুণ্যহীনতা আর দায়িত্ববোধের অভাব দেখে ভীত সন্ত্রস্ত। বঙ্গভবনের শেষ দিনগুলোর ভূমিকায় বিচারপতি সায়েম তাঁর অনুভূতি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। এর অভ্যন্তরে রয়েছে আরো অনেক অনেক ভয়ঙ্কর কথাবার্তা। এসব কথা বিচারপতি সায়েমের শুধু কি একার কথা? রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ বাদই দিলাম। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরস্পরকে যেভাবে সম্বোধন করেন, সেদিকে নজর দিলেও একই রূপ। যে জনসাধারণকে নিয়ে তাদের হাজারো স্বপ্ন রঙ্গীন হয়ে ওঠে 'সে জনসাধারণ' তাদেরকে যে চোখে দেখেন, তাও তাদের জানা।

কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশ রাজনীতি দলছুটদের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার মোহ রাজনীতিকদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এ জন্য তারা যা কিছু করতে পারেন তার তুলনায় দলত্যাগ এক তুচ্ছ ব্যাপার। সবারই জানা কথা, এই দলছুট প্রবণতা একদিকে যেমন দেশের প্রতিষ্ঠিত দলগুলোকে খণ্ড-ছিন্ন শতধা বিভক্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনি দলীয় রাজনীতিকে করেছে অবজ্ঞার বস্তুতে পর্যবসিত। তার ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়, সু-শাসন ও স্ব-শাসনের প্রধান অন্তরায় জনগণের অশিক্ষা, গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব আর স্বার্থপরতা। এদেশের রাজনীতি অবশ্য প্রমাণ করেছে, জনগণের অশিক্ষা বা স্বার্থপরতা নয়, বরং রাজনীতিকদের সীমাহীন স্বার্থপরতা আর ক্ষমতার প্রতি অন্তহীন মোহই এ সবের জন্যে সবচেয়ে বেশী দায়ী। জাতীয় কেবিনেটে স্থান লাভ করার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এ প্রবণতা ডান, মধ্যম ও বামের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

আমাদের ছাত্র মাহবুব, তাঁর এম, ফিল অভিসন্দর্ভে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে এ প্রবণতার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতি এরশাদের মন্ত্রিপরিষদে এখন পর্যন্ত যে ৮০ জন সদস্য স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১৩ জন সামরিক কর্মকর্তা, ৯ জন বেসামরিক সিভিল সার্ভেন্ট, ৭ জন টেকনোক্র্যাট (চিকিৎসক, ডাক্তার, আইনজীবী), ৬ জন বাণিজ্যিক প্রশাসক আর ৪৫ জন রাজনীতিক। ৪৫ জনের সকলেই কিন্তু কোন না কোন পর্যায়ে দলত্যাগকারী রাজনৈতিক নেতা। ১৫ জন এসেছেন বিএনপি থেকে, ৮ জন মুসলিম লীগ (বা অনুরূপ ডানপন্থী দল) থেকে, ৯ জন বামপন্থী দলগুলো থেকে (ন্যাপ, ইউপিপি, গণতান্ত্রিক দল), দুই জন জাসদ থেকে, একজন জাতীয় লীগ থেকে আর ১০ জন আওয়ামী লীগ থেকে। এ ৪৫ জনের মধ্যে এমন কয়েক জন নেতা আছেন যাঁরা এরই মধ্যে 'প্রফেশনাল' মন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। সরকার পরিবর্তন হোক তাঁরা কিন্তু মন্ত্রী হবেনই।

আর একটু পিছিয়ে গেলেও একই ছবি চোখে পড়ে। ১৯৭৬–১৯৮১ সালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদ ও মন্ত্রিসভায় যে আশি জনের আর্থ–সামাজিক পটভূমি জানা গেছে তাতে দেখা যায়, ১৩ জন ছিলেন সামরিক কর্মকর্তা, ৮ জন বে–সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ১৮ জন ছিলেন বুদ্ধিজীবী (ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী), ১০ জন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং ৩১ জন ছিলেন রাজনীতিক। ৩১ জন রাজনীতিকের ৯ জন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ডানপন্থী দল ত্যাগ করে মন্ত্রী হন, ৯ জন বামপন্থী দলগুলো ত্যাগ করেন, ১ জন কৃষক প্রজা পার্টি এবং ৬ জন আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে মন্ত্রী হন। এই তীব্র দলছুট প্রবণতার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশ রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়েছে মারাত্মক।

এ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্ভবতঃ বিচারপতি সায়েম তার বিবরণে সামরিক বাহিনীর প্রতি আবেদনমূলক এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর কথায়, "শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতিকদের যদি সুযোগ না থাকে তবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে না এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি শক্তিশালী না হয়, তবে জাতির স্বাস্থ্য ও সুস্থতাও নিশ্চিত হবে না। দেশের মঙ্গল চিন্তায় রেখে সামরিক কর্মকর্তাদের এদিকে নজর দিতে হবে।"

কিন্তু কথা হলো, এটা কি সামরিক কর্মকর্তাদের কাজ? তাঁরা দেশ শাসনে রাজনীতিকদের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করবেন কেন? বিচারপতি সায়েম, রাজনীতিকদের কার্যকলাপে সম্ভবত হতাশ হয়ে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাঁর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এ অনুধাবন যথার্থ নয়। রাজনীতিকদের জন্য যদি তাঁরা ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবেশ ঘটবে তাঁদেরই ইচ্ছানুসারে এবং হয়েছেও তাই। বিচারপতি সায়েম নিজেই লিখেছেনঃ "পরামর্শের জন্য রাজনীতিকরা ক্যান্টনমেন্টে যাতায়াত করতেন।"

ক্যান্টনমেন্টে যাতায়াত করে, সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামরিক শাসন উচ্ছেদের পরিকল্পনা করে আসছেন। বিরাট বিরাট জনসভায় দিনের বেলা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গার করে সন্ধ্যার পর তাঁরাই যান ক্যান্টনমেন্টে পরামর্শের জন্য। বাংলাদেশ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর এ ভূমিকা এ

www.pathagar.com

দেশের রাজনীতির এক নির্মম বাস্তবতা। এই বাস্তবতা সম্পর্কে জনগণ সচেতন। তাই অনেক ক্ষেত্রে জনগণ সরকার বিরোধী হলেও বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। এদেশে যে কোন আন্দোলনে এ সত্য অনুধাবন যোগ্য।

কেউ কেউ বলেন, রাষ্ট্রপতির হাতেই সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি। সত্যিই তো। যাদের দয়া করে মন্ত্রিত্ব দেয়া হয় তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বিচারপতি সায়েম। তিনি লিখেছেনঃ "বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সুসংহত নয়। ফলে রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে। এর চূড়ান্ত পরিণতি ব্যক্তি পূজা" (Personality cult)।

বলতে দ্বিধা নেই, এজন্যে ব্যক্তি যতটুকু দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত দল। নতুন আলোকে এসব সমস্যা অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমার প্রশ্ন মাননীয় বিচারপতির নিকট। যেসব কথা তিনি তাঁর শেষ কথায় ব্যক্ত করেছেন, প্রথম পর্যায়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি কেন? বাংলাদেশে এটাও একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। যতদিন পদে অধিষ্ঠিত আছি ততদিন চারদিকে দেখি অগ্রগতির দুর্বার বন্যা। দেশ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে। পদ থেকে সরে আসলেই কিন্তু অন্য দৃশ্য চোখে পড়ে। দেশটা ধ্বংসের মুখোমুখি। বেশ কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলতে শুনেছি, মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থেকে নয় বরং মন্ত্রিত্ব যাবার পর। বিচারপতি সায়েম সম্পর্কে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ইঙ্গিত নেই এখানে, তবে রাজনীতিকদের সততা, নিষ্ঠা সম্পর্কে চারদিকে হাজারো প্রশ্ন। তাই সমালোচনা নয়, বরং আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মসমালোচনার ক্ষেত্র উর্বর করুক বিচারপতি সায়েমের সংক্ষিপ্ত আলেখ্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সমস্যা ঃ ব্যক্তিত্ব কাঠামো

[এক]

যৌথ উদ্যোগে কেন আমরা এত ব্যর্থ হচ্ছি? ব্যক্তিগত উৎকর্ষ আমাদের অনেকেরই রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক উত্তম কাজ আমরা করেছি। কিন্তু সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় কেন এত হোঁচট খাই? প্রশ্নগুলো বহুদিন ধরে মনকে আন্দোলিত করে, কিন্তু যথার্থ উত্তর লাভ করিনি। ক'বছর আগে মিউনিকে এক সেমিনারে যোগদানের জন্য গিয়েছিলাম। দু'দিন দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর দেশে ফেরার পথে রেল স্টেশনে বিদায় জানাতে এসে জনৈক জার্মান বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "তোমরা তো লোক ভালই। দক্ষতা-নৈপুণ্যের যে কোন মানদণ্ডে তোমরা কৃতী। অথচ তোমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এত অনুন্নত কেন? কেন তোমরা এত পশ্চাদপদ"?

এমনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম আরও ক'বছর আগে, ভিয়েনায়। সেখানে এক আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছিলাম। আলোচ্য বিষয় ছিল "সামরিক বাহিনী ও তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ"। সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে কিভাবে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিঃশেষ হয় তাই আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম। কিভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল করা যায়, সে সম্পর্কেও আমার সুপারিশ ছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর মন্তব্য ছিলঃ "তোমাদের মত গবেষক, বুদ্ধিজীবী ঐ দেশে থাকা সত্ত্বেও কেন তোমার দেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল হচ্ছে না আমরা বুঝতে অক্ষম"।

আমরা ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অধিকারী হয়েও সমষ্টিগত উদ্যোগে ব্যর্থ। কেন এমনটি হয়? আমরা ব্যক্তিগত বদান্যতায় বহু জনহিতকর দাতব্য সংস্থা গড়ে তুলেছি, কিন্তু ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে দান গ্রহণকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারিনি। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত উদ্যোগে "গুচ্ছগ্রাম" তৈরী হচ্ছে, কিন্তু জাতীয় ভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনে ব্যর্থ হয়েছি। কিছু নেতা-নেত্রীর সদিচ্ছার ফলশ্রুতিতে "পথকলি" তৈরী হচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিক পর্যায়ে নিরক্ষরতার মূলকে শিথিল করতে সক্ষম হইনি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ কেউ এতিমখানা তৈরী করেছি, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে অসহায় এতিমদের পুনর্বাসনে সার্থক উদ্যোগ নিতে পারিনি। সমাজ জীবনে এ প্রবণতার ফল হয়েছে বিষময়। যখনই ঝড় উঠেছে, যখনই অনিশ্চয়তার গুমোট হাওয়ায় তিষ্ট হয়েছি, তখন ঐ যে বলেছি, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের উৎকর্ষ রয়েছে, আমরা নিজস্ব গণ্ডিতে ছোট্ট পৃথিবী রচনা করে এবং তার সব বাতায়ন বন্ধ করে আত্মতুষ্টি লাভ করেছি। ফলে অনেকের ব্যক্তিগত জীবন সুখের হয়েছে বটে, কিন্তু বৃহৎ পরিবারতুল্য সমাজে জীবন কোন দিন জীবন্ত হয়ে উঠলো না। শুধু তাই নয়, সামাজিক সংগঠনগুলোকে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ করে ফেলেছি।

সমষ্টিগত পর্যায়ে তাই যে দিকে তাকানো যায়, আমাদের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। এ সমাজে প্রথম সারির বহু শিক্ষক রয়েছেন, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের সার্বিক পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে অসহনীয় এক নৈরাজ্য। এ দেশে প্রথম শ্রেণীর অনেক অর্থনীতিবিদ সৃষ্টি হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়

www.pathagar.com

অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমরা নামিয়ে এনেছি এক অবাঞ্ছিত বন্ধ্যাত্ব। এ দেশে ব্যক্তি পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চেতনা প্রখর হয়েছে দিনে দিনে, কিন্তু তিলে তিলে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিঃশেষ করেছি।

শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও আমাদের তরুণদের কৃতিত্ব চোখে পড়ার মত। বছর কয়েক আগে আবুধাবীর এক হোটেলে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলোচনা হচ্ছিল। তারা আবেগ ভরে বলেছিলেন কিছু কথা। সে কথা আজও মনে আছে। "বাংলাদেশী চিকিৎসক মানে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক। চিকিৎসার সাথে সাথে অসুস্থ ব্যক্তি যা চান তারা তা দিতে জানেন। তাদের সেবার মান চমৎকার।"

নিজেদের প্রশংসা শুনেছি বহু পাকিস্তানীর কাছে। অবিভক্ত পাকিস্তান আমলের কথা বলছি। "বাঙ্গালি শিক্ষক সব চেয়ে সেরা শিক্ষক।" বিদেশে বাংলাদেশী প্রকৌশলী, এমনকি দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের কর্মের মান সম্পর্কেও বহু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। সেদিন জাপানী দূতাবাসের জনৈক সচিবের বক্তব্য ছিল তেমনি প্রশংসাসূচক। "বাংলাদেশের কর্মীরা আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য এবং সম্মানিত।"

ঐ সব কর্মী বা চিকিৎসক বা প্রকৌশলী যখন বাংলাদেশে কর্মরত থাকেন, বিশেষ করে যখন তারা কোন সমষ্টিগত উদ্যোগে রত হন তাদের ব্যর্থতাও প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও ব্যক্তি শিক্ষক, ব্যক্তি চিকিৎসক বা ব্যক্তি প্রকৌশলীর কৃতিত্ব সর্বজন প্রশংসিত।

ব্যক্তিগত নৈপুণ্যর বিকল্প নেই, কিন্তু নৈপুণ্য ব্যক্তিকে ছাপিয়ে সমষ্টির গুণে রূপান্তরিত না হলে জাতীয় অগ্রগতির সম্ভাবনা ডানা মেলে না। এ সমাজে ব্যক্তি শিল্পীর মান উঁচু, কিন্তু যৌথ শিল্পকর্ম কোন মান অর্জন করেনি। এদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রুচিশীলতা সবার চোখে পড়ার মত, কিন্তু সার্বিক ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হয়নি। সঙ্গীত, কারুশিল্প, চারুকলায় বহু স্মরণীয় নাম এ সমাজের কাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকার, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুরের ঝংকার তুলতে এখনও আমরা দক্ষ হইনি। যৌথভাবে সৃজনশীল ভূমিকা পালনে এখনও আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়নি। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (personal cleanliness) সামগ্রিক পর্যায়ের ক্লেদকে (collective filth) মুছে ফেলতে পারেনি।

এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এ সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে আমাদের ব্যক্তিত্ব কাঠামোয়। এ কাঠামোয় চাই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, বিশেষ করে আমাদের তরুণদের ব্যক্তিত্বে। তাদের মাধ্যমেই আমরা বেঁচে থাকতে চাই হাজার বছর। তাদের ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ হলে সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে সাংগঠনিক নৈপুণ্য, আর সাংগঠনিক নৈপুণ্যই হয়ে উঠবে জাতীয় অগ্রগতির চাবিকাঠি।

কিভাবে ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব? এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই, নেই কোন স্বীকৃত ফরমূলা। তবে সুশিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, রুচিকর পরিবেশ এর অনুকূল। এ জন্য প্রয়োজন আত্মসমালোচনা, সমালোচনা নয়। এ জন্য চাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিস্তীর্ণ উপত্যকা। এ জন্য দরকার পারস্পরিক আস্থাশীলতার এক উর্বর ক্ষেত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থের ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপের সমন্বয়ে সামগ্রিক স্বার্থের মহাদেশ গড়ে না তুললে বৃহত্তর সমাজ জীবন সমৃদ্ধ হবে না।

www.pathagar.com

এ জন্য কিছুটা আকাশমুখীতারও প্রয়োজন। যতক্ষণ কেউ মাটিতে অবস্থান করে তখন তার চারদিক ঘিরে থাকে অসমতল পরিবেশ আর অসাম্য। মাত্র পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠলেই দেখা যাবে, নিম্নে সব সমান। তাই মাটিতে শিকড় রেখে পারস্পরিক সহনশীলতার এক টুকরো নির্মল আকাশ তৈরী করা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে, নিজেকে শ্রদ্ধা করে এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এবং অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, বিশেষ করে আত্মস্বার্থের সাথে সার্বিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের দল বিকশিত হলে ব্যক্তিজীবন যেমন পরিপূর্ণ হবে সমষ্টিগত জীবনও তেমনি সার্থক হয়ে উঠবে।

সুষম ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতেই ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য সব চেয়ে প্রকট। সংগঠন গড়ে ওঠে বটে কিন্তু অচিরে তা পারস্পরিক আস্থাহীনতার স্পর্শে শতধা বিভক্ত হয়। দেশের রাজনৈতিক–সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর দিকে তাকালেই চলবে। এ দেশে শুধু প্রতিষ্ঠান টিকে রয়েছে, কেননা ব্যক্তিগত উৎকর্ষই প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র। সংগঠনগুলো অন্তঃসারশূন্য, কেননা সংগঠনে থাকে যৌথ দায়িত্ব এবং সমষ্টিগত উদ্যোগ। প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ব্যক্তি জীবন সুন্দর করে। কিন্তু জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য আনে সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা। এ দিকে সবার দৃষ্টি দিতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন।

[দুই]

সক্ষম হয়েও যিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন, বিত্তবান হয়েও যিনি বিত্তহীনের আচরণে অভ্যস্ত, তিনি কোনদিন এ সমাজে শ্রদ্ধা অর্জন করেননি। আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা কৃপণের নাম শুনে সব সময় নাক সিঁটকেছে। এ সমাজে কার্পণ্য সব সময়ই নিন্দনীয়। যার যা প্রাপ্য তাকে তা না দেয়া বা তার চেয়ে কম দেয়াও এক ধরনের কৃপণতা। কার্পণ্যকে ঘৃণা করা তাই এক ধরনের সামাজিক মূল্যবোধ।

সম্প্রতি এ মূল্যবোধেও পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে সম্মিলিত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে উত্তম পদক্ষেপ অকৃপণ প্রশংসা লাভ করে, কিন্তু সমষ্টিগত পর্যায়ে উত্তম কর্মকে উত্তম বলতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলে তো কথাই নেই। কারো ভাল কাজ অন্যের চোখে পড়ছে না। অন্যদিকে, নিজেদের সব কিছু উত্তম।

বেশ ক'দিন আগের কথা। নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রের সাথে আলোচনা হচ্ছিল। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্দশা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু জনপ্রতিনিধি আসছেন না। সংসদ আছে কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থা নেই। মন্ত্রিপরিষদ বিদ্যমান কিন্তু মন্ত্রিপরিষদীয় দায়িত্ব কই? সবারই এক অভিযোগ, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রকে অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য করে ছেড়েছে।

এ পর্যন্ত হলেও চলতো। কিন্তু আজকাল তা হয় না। সবাই আমরা পেছনে তাকাই, অতীতের মাটি খুঁড়ে বের করি গলিত শবের পাশ থেকে সময়ের ত্রুটি–বিচ্যুতি। জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

তরুণদের মতে, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা শেখ মুজিব নিজেই করেছেন। আওয়ামী লীগপন্থীদের কথায়, শেখ মুজিবের পর সব সরকারই অবৈধ, শুধুমাত্র অগণতান্ত্রিক নয়। জামায়াতপন্থীরা বলেন, ইসলামী আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সরকার পুরোপুরি গণতান্ত্রিক হতে পারে না। জামায়াত বিরোধীদের মতে, সাম্প্রদায়িক শক্তি গণতন্ত্রের জন্য অচল। এদেশে গণতন্ত্র চর্চায় স্বাধীনতা বিরোধীদের কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়।

সোজা কথা, গণতন্ত্র চাই সবাই, কিন্তু নিজেদের শর্তে। শর্ত পূরণ না হলে গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। মনের মত না হলে কিসের গণতন্ত্র? মনের মত হলে চাই, তা উৎকৃষ্ট হোক বা না হোক।

এ সমাজের মনমানসিকতায় এইটি সবচেয়ে বড় সংকট আর এর মূলে রয়েছে ব্যক্তিত্ব কাঠামো–সংকীর্ণ, কর্তৃত্ববাদী, সনাতন ব্যক্তিত্ব। মানসিক কৃপণতা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেউ কারো ভাল দিককে অভিনন্দিত করি না। নিন্দা করতে ভয়ঙ্করভাবে অভ্যস্ত আমরা। কারো প্রশংসা মুখে আসে না, এমনকি সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরও। ফজলুল হক? তিনি তো ছলে বলে কৌশলে শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকতেই চেয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি পূর্ব বাংলার জন্য শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করলেন। মাওলানা ভাসানী? অগ্নিবর্ষী বক্তা বটে, কিন্তু বাস্তবতা বর্জিত।

এমনি প্রবণতা। শেখ মুজিবই দেশে একনায়কতন্ত্রের সূচনা করলেন! প্রেসিডেন্ট জিয়াই সামরিক বাহিনীকে শাসন ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। জেনারেল এরশাদ? তিনিই তো শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছেন।

ইতিহাসের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা জাতীয় গর্ববোধে জারিত হয়েই হয় ঐতিহ্য। আর ঐতিহ্য? যে সমাজে ঐতিহ্য নেই সে সমাজ দরিদ্র। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে তরুণরা ডুব দেয় অতীতে। ডুবুরীর মত ডুব দিয়ে আবিষ্কার করে সামাজিক ঐতিহ্যের মণিমুক্তা। অতীতকে নিয়ে তারা গর্ব করে। বর্তমানকে করে তুলে আলোকোজ্জ্বল আর ভবিষ্যতকে মোহনীয়। এ সমাজে আমরা অতীতকে দেখি সন্দেহের চোখে, ঝাঁপ দেই হতাশাগ্রস্ত শিকারীর মত এবং তুলে আনি ক্ষত–বিক্ষত অর্ধমৃত তৃণখণ্ড বা দুর্গন্ধযুক্ত লতাগুল্ম। আত্মবিশ্বাস নেই বলে অপরের উপর বিশ্বাস রাখতে ভয় পাই। নিজকে সম্মান করি না বলে অপরকেও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করি।

তাই আমাদের অনেকের চোখে ফজলুল হক একজন সুচতুর ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাত্র। নব্য বাংলার অন্যতম স্রষ্টা, মধ্যবিত্ত মুসলিম বাংলার শ্রেষ্ঠতম দিশারী, গ্রামীণ কৃষকদের প্রিয় হক সাহেব, বঞ্চিত মানবতার অকৃত্রিম দরদী হিসেবে তাঁর যে আসল পরিচয় তার অনেকটা ঢাকা পড়ে আমাদের কৃপণ প্রবণতার দেয়ালে। সোহরাওয়ার্দী বা ভাসানীর অবদানকে ছোট করে দেখার প্রবণতাও ঐ একই কারণে। এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির নিপুণ কুশলী হিসেবে, এ জাতির মর্যাদাকে সমুন্নতকারী জাতীয় নেতা হিসেবে, এমন কি যোগ্যতম সংগঠক হিসেবে সোহরাওয়ার্দী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। মাওলানা ভাসানীর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতার মান যাই থাক প্রায় আড়াই দশকব্যাপী তিনিই ছিলেন এ জাতির বিবেক।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবে সবাই আমরা গৌরব বোধ করি। কিন্তু শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ না করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্ণনা বা বিশ্লেষণ যে কত বড় আত্মবিস্মৃতি এবং কত বড় কৃতঘ্নতা তা যত তাড়াতাড়ি স্বীকার করা যায় ততই মংগল। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ যখন সমগ্রজাতি ভূলুণ্ঠিত, সম্বিতহীন তখন মেজর জিয়ার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যারা ভুলে যেতে পারেন তাদের সম্পর্কে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

বহু জ্ঞানী গুণীর স্পর্শ–ধন্য এ বাংলাদেশ। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ জাতি হতে পারে সম্মানিত। তাদের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে এ জনপদ হতে পারে মূল্যবান। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই শুধু আজকের নেতৃবর্গ তাদের অনুসারী ও সমাজের তরুণদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

শুধু তাঁরাই কেন, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব দিকপাল তাদের প্রতিভার আলোকে আমাদের পথের অন্ধকার দূর করেছেন তাদের জীবন ও কর্ম গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে আমাদের। এখনও আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন বা জেফারসনের উদ্ধৃতি ছাড়া সমাপ্ত হয় না। প্রতিবেশী ভারতেও দেখা যাবে, গান্ধী বা নেহেরুর উদ্ধৃতি ছাড়া কোন রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা শেষ হয় না। ফ্রান্স এবং বৃটেনেও দেখা যায়, দেশের সেরা ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রচিত হয় জাতীয় গৌরবের সুরম্য অট্টালিকা।

আমরা সমালোচনা করি প্রায় সবার, শুধুমাত্র নিজের ছাড়া। আমরা প্রশংসা করি না কারো, এমন কি নিজেরও না। এটিও কার্পণ্য। আমাদের ব্যক্তিত্ব কাঠামোর এ প্রবণতা এমন সাত পাকে বাঁধা পড়েছে যে, এ থেকে মুক্ত হতে আমরা পারছি না।

আমাদের তরুণদের তাই প্রয়োজন আকাশমুখিতার। আকাশের দিকে তাকালে নিজের স্বল্প উচ্চতা আর চোখে পড়বে না। নিজেদের উচ্চতা কম বলেই প্রয়োজন সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহৎ বট বৃক্ষের ন্যায় যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দিকে তাকানো, অকৃপণভাবে, উদারচিত্তে। তরুণদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তাই চাই অকৃপণ এক দৃষ্টিভঙ্গী, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে আকাশের মত উদারচিত্ত আর যার যা প্রাপ্য তা দেয়ার মনোভাব। এ জন্য তরুণদের যে দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্ব রয়েছে প্রবীণদের, সমাজের অধিপতি শ্রেণীর।

www.pathagar.com

জনগণ ও প্রশাসন

বছর দুই আগের কথা। আমাদের এক প্রিয় ছাত্র, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, সেদিন সরকারের, দেশের, সমাজের হাজারো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। অল্পদিনে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা, ভাল কাজে প্রায় প্রত্যেকের অনীহা, এমন কি আমাদের শেখানো তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে যে ব্যবধান সে সম্পর্কেও তিনি বললেন।

শুনে খুশী হই। ছাত্রাবস্থায় দেশের অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান হাজারো সমস্যা, রাজনীতির দিকনির্দেশে ব্যর্থতা,সামাজিক মূল্যবোধে সীমাহীন অবক্ষয় এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হোত। মনে হয়েছে, দায়িত্ব পেলে এসব তরুণ কিছুতেই হাল ছাড়বে না। তাঁর কথাবার্তায় এখনও অতীতের সুর। তিনি এখনও অন্যদের মত হননি। দেশের সমস্যা বোঝেন আর তার সমাধানে এখনও আগ্রহী।

শিক্ষক কারো কাছে হার মানতে নারাজ। কিন্তু ছাত্রের কাছে? ছাত্রের নৈপুণ্যে, শিষ্যের দক্ষতায় শিক্ষকের বুক ভরে ওঠে অনাবিল এক গর্বে। মাননীয় মন্ত্রীর কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনলাম। অন্তর থেকে এলো আশীর্বাদ। ভাল থাকেন, যেখানেই থাকেন।

এছাড়া শিক্ষক আর কি বলতে পারে? ভালো লাগলো এই ভেবে, মাননীয় মন্ত্রী এখনও আশাবাদী, যদিও তাঁর সুরে অনেক হতাশা, অনেক আশাভঙ্গের ব্যথা। যাবার সময় বললেন, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগওয়ালা গাড়িতে ঘুরতে ফিরতে প্রত্যেক ট্রাফিক মোড়ে পাই লম্বা লম্বা স্যালুট, কিন্তু বুঝতে স্যার এতটুকু অসুবিধা হয় না, সাধারণ মানুষ আমাদের দিকে তাকায় সন্দেহের দৃষ্টিতে। মনে হয় মন্ত্রী হয়ে তাদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেছি।

আরও কিছুদিন আগের কথা। এক গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে আমাকে এক জেলা হেডকোয়ার্টারে ক'দিন কাটাতে হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয়েছিল সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। জেলা প্রশাসক আমার এককালের প্রিয় ছাত্র। সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁরও ছিল গভীর আগ্রহ। জাতীয় অগ্রগতি, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাল লেখাপড়া তাঁর। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেখা করতে এলে বলেছিলামঃ ভাগ্যবান যুবক, কাজ খুঁজছিলেন, কাজ পেয়েছেন। দ্যাখেন, কিছু করতে পারেন কি না।

সালাম দিয়ে উত্তর দিয়েছিলঃ আমার জন্য দোয়া করবেন। পরাভব মানতে তো শেখাননি। কোন দিন পরাভব মানবো না, স্যার, দেখবেন। দেখলাম সেদিন। তরুণ জেলা প্রশাসক আকারে–ইঙ্গিতে বললেনঃ সাধারণ মানুষ আমাদের আপনজন হিসেবে এখনও গ্রহণ করছে না। তাঁদের কাছে আমরা যেন দূরের, অনেক দূরের মানুষ। বহু চেষ্টা করে তাঁদের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়েছি, তা প্রীতির নয়, বরং সন্দেহ মিশ্রিত এক ধরনের ভীতির। যে প্রকল্পের জন্যে গিয়েছিলাম তা ছিল ই· আই· পি· (আর্লি ইমপ্লিমেন্টেশন প্রজেক্টস) প্রকল্প। বিদেশী সংস্থার অর্থানুকূল্যে ছোটখাট সেচ প্রকল্পের আর্থ–সামাজিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা–নিরীক্ষা। বৃহত্তর সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চলে বহুসংখ্যক হাওরে ফসলকে অকাল বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা

www.pathagar.com

করাই এসব প্রকল্পের মৌল লক্ষ্য। মে মাসের প্রথম দিকে ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে পাহাড়ী ঢল অমিততেজ দৈত্যের মত নেমে আসে হাওরের দিকে। আর ক'দিনের মধ্যে আধপাকা ধান দরিদ্র কৃষকের চোখের সামনে তলিয়ে যায়। কারো কিছু করার থাকে না। কৃষক শুধু তার চোখের পানি মোছে আর সারা বছরের জন্যে অর্ধাহার-অনাহারের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। কোনভাবে যদি এ অকাল বন্যাকে মাত্র সপ্তাহ দুই কি তিনের মত ঠেকিয়ে রাখা যেত-তাহলেই চলতো।

ইঞ্জিনিয়ার ও পানি বিশেষজ্ঞরা হাওরের চারপাশে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করে এর সমাধান দিতে চান। কিন্তু কৃষকদের বক্তব্য একটু ভিন্ন। তাঁরা বলেন, হাওরের চারপাশে উঁচু বাঁধ নির্মাণ নয়, বরং নদী এবং পাশের খালের গভীরতা বৃদ্ধি করে নদী ও খালের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিই এর সমাধান। হাওরের পাশে বাঁধ দিলে পাহাড়ী ঢলে তাও ভেসে যায়। ফলে বাঁধ দিলে লাভবান হয় শুধু কন্ট্রাক্টররা আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষককুল। একদিকে তাদের ফসল নষ্ট হয়, অন্যদিকে বাঁধের জন্যে জমি তাদেরই ছেড়ে দিতে হয়। তাঁরা আরও বলেন, বছর বছর নদীতে যে পরিমাণ পলি জমে, তা না সরিয়ে বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। বাঁধের উচ্চতা তো প্রতি বছর বাড়ানো যায় না।

ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের কথা শুনেছি, শুনেছি কৃষকদের কথা। যত শুনেছি, মনে হয়েছে উভয়ের চিন্তাভাবনা-যুক্তির মধ্যে ব্যবধান পর্বতপ্রমাণ। কৃষকদের সঙ্গে একান্তে আলোচনার সময় বলেছিলাম ঃ সমস্যাটি যখন আপনারা এত গভীরভাবে অনুধাবন করেন, তখন বলেননি কেন ঐ সব ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের?

তাঁরা উত্তরে যা বলেন, তা গুরুত্বপূর্ণ ঃ আমরা চাষাভুষো মানুষ, সাহেবদের সামনে সব কথা কি বলতে পারি? আসলে তাই। সাধারণ মানুষ সাহেবদের সামনে সব কথা যেমন বলতে নারাজ, সাহেবরাও তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করতেও ব্যর্থ। মন্ত্রী মহোদয় ট্রাফিক পুলিশের লম্বা স্যালুট পেলেও সাধারণ জনের কাছ থেকে বহু দূরে। জেলা প্রশাসক তার গভীর আন্তরিকতা সত্ত্বেও জনগণের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অক্ষম। ইঞ্জিনিয়াররা দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করেও জনগণের মনের কথা জানতে পারেননি। অন্য কথায়, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে অনতিক্রম্য এক ধরনের দূরত্ব। এ দূরত্ব দূর করতে না পারলে যাদের জন্যে উন্নয়ন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে পড়ছে আর জাতি হিসেবে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সে তিমিরেই থেকে যাচ্ছি।

এ দূরত্ব অবশ্য একদিনে সৃষ্টি হয়নি। তিলে তিলে পলি সঞ্চিত হয়ে যেমন নদীবক্ষ স্ফীত হয়েছে, যুগ যুগ ধরে জনগণের প্রতি ঔদাসীন্য তেমনি সৃষ্টি করেছে সাধারণ মানুষ আর প্রশাসনের মধ্যে ব্যবধান। আমাদের জাতীয় কর্মকাণ্ডে ব্যর্থতার যে কালোছায়া তার মূলে এ দূরত্ব কাজ করছে ভয়ঙ্করভাবে। এর মূল উৎপাটন করতে হবে।

কিন্তু বললেই কি তা সম্ভব? এ সমস্যার অতীত আছে, আছে এর দীর্ঘ ইতিহাস। তা অনুধাবন করেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। বৃটিশ ভারতে প্রশাসনের ভাবমূর্তি এভাবেই তৈরী হয়। দূরবর্তী, গণবিচ্ছিন্ন, ভয়ঙ্কর প্রশাসনকে এরূপেই সুসজ্জিত করা হয়। তখন সরকারের সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাই প্রয়োজন ছিল। বিদেশী প্রশাসকদের নীল চক্ষু,

www.pathagar.com

সাদা রং, দীর্ঘ গড়ন আর ভীতির পরিবেশ জনগণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্যে ছিল যথেষ্ট। এসব মনে রেখেই বৃটিশ ভারতে প্রশাসনের কাঠামো, কার্যক্রম, পরিবেশ ও প্রতিবেশ তৈরী হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছিল যদিও 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' তথাপি এ সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ১৮৬৪ সালের পূর্বে এ সার্ভিসে কোন ভারতীয় সদস্য ছিলেন না। ১৮৬৪ সালে সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৭১ সালে আরও তিন জন ভারতীয় এ সার্ভিসে যোগ দেন। তাঁদের একজন অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অল্পদিনের মধ্যে চাকরিচ্যুত হন।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় সদস্যগণ নিয়োগ লাভ করতেন সমাজের উঁচুস্তর থেকে, বিশেষ করে ভূমি মালিক, শিল্পপতি, বণিক, ব্যবহারজীবী শ্রেণী থেকে। এদেশী হলেও শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তা-চেতনায়, পোষাকে-আশাকে, কথা-বার্তায়, আচরণে তাঁরা বিদেশী সাহেবদের মতই ছিলেন। জন লরেন্স তাই এদেশী সিভিল সার্ভেন্টদের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'এরা আচার-আচরণে বৃটিশ কর্মকর্তাদের চেয়েও ছিল অধিক বৃটিশ' (They were more British than the British Civil Servants)। সাধারণের সঙ্গে এসব কর্মকর্তার কোন যোগসূত্র ছিল না।

লর্ড মেকলে (Lord Macauley) এদেশে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যুক্তি হিসেবে যা বলেছিলেন, তা এসব কর্মকর্তা সম্পর্কে পুরোপুরি খাটে। তিনি বলেছিলেনঃ 'তাঁরা হবেন এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা রক্তে ও রং-এ ভারতীয় কিন্তু আচরণ, মতবাদ, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ।' (A class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.)। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু এসব কর্মকর্তাকে 'সাদা ব্রাহ্মণ' (White Brahmins) বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে বৃটিশ ভারতে প্রশাসন কোনদিন জনগণের কাছাকাছি আসেনি, আর আসার কথাও ওঠে না।

১৯৪৭ সালের পর স্বাধীন ভারতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুদের কাছে বেশ খানিকটা ক্ষমতা অর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু পাকিস্তানে সি·এস·পি, পি·এস·পি প্রমুখ এলিট কর্মকর্তাদের প্রভাব এতটুকু কমেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পায়।

এজন্যে কিছুটা দায়ী ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেই। তিনি ছিলেন 'জাতির জনক'। জনগণ শ্রদ্ধাভরে তাঁকে ডাকতেন 'কায়দে আজম' (শ্রেষ্ঠ নেতা) বলে। তিনি শুধুমাত্র গভর্ণর জেনারেলই ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিলেন গণ পরিষদের সভাপতি এবং আইন পরিষদের আইন উপদেষ্টা। পাকিস্তানের সর্বত্র জুম্মা ও ঈদের নামাজের পর খোত্‌বায় তার নাম উল্লেখ করা হতো।

জিন্নাহ সাহেবের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্যাম্পবেল জনসন (Campbell Johnson) লিখেছেনঃ 'তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সম্রাট বাহাদুর, ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ, স্পীকার ও প্রধানমন্ত্রী। আর সব কিছুর সমন্বয়ে এক প্রবল প্রতাপশালী কায়েদে আজম'। বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল ভারত সচিবের নিকট দায়ী থাকতেন আর চূড়ান্ত পর্যায়ে দায়ী

www.pathagar.com

থাকতেন বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট, কিন্তু জিন্নাহ কারো কাছে দায়ী ছিলেন না। সমগ্র জাতি তার স্রষ্টা ও জনকের নিকট সর্বদা থাকতো কৃতজ্ঞচিত্ত। তিনি চাইলে, সম্ভবতঃ রাজকীয় পদে, তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হোত।

কায়েদে আজম যদিও তাঁর রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের মাধ্যমে পাকিস্তান অর্জন করেন, তথাপি সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করে সিভিল সার্ভেন্টদের উপর নির্ভর করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাই একমাত্র সংহত মাধ্যম। পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের তিনটিতে, পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, তিন জন আই·সি·এস কর্মকর্তাকে প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। দু'জন গভর্ণর-পাঞ্জাবের স্যার ফ্রান্সিস মুডি (Sir Francis Mudie) ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের স্যার জর্জ ক্যানিংহ্যাম (Sir George Cunningham)— প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করতেন। পূর্ব বাংলায় স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণ (Sir Frederick Bourne) মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করতেন না বটে, তবে মন্ত্রিসভার কার্য-বিবরণীর রিপোর্ট নিয়মিত লাভ করতেন। শুধু তাই নয়, গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহ্ সাহেবও মন্ত্রিদের পাশ কাটিয়ে সচিবদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতেন।

এভাবে প্রশাসকগণ পাকিস্তানে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রাষ্ট্রভৃত্য হিসেবে জনকল্যাণ সাধন অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণই তাঁরা করে এসেছেন প্রায় দু'শো বছর। কোন কোন কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে কিভাবে রাজনীতি করতে হয়, তারও পাঠ দেয়ার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৬ সালে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের সদস্য ইস্কান্দার মীর্জা রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ 'তাঁরা (রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ) তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে যে কোন সময় তিনি তাঁদের তল্পিতল্পাসহ বিদেয় করবেন। সামরিক বাহিনী তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে। (He had the army in the palm of his hand and he would use it to send them packing if they got in his way too much)। এরই কিছুদিন পূর্বে শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণ পরিষদে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর পদ অনেক ভদ্রলোক অলংকৃত করেছেন সত্য, কিন্তু প্রশাসক চক্রের খেয়াল-খুশি মতো যদি এ পদের অধিকারীকে কান ধরে বের করে দেয়া হয়, তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা মোটেই সম্মানজনক ব্যাপার নয়' ("To be Prime Minister of Pakistan, which has been held by certain honourable gentlemen who have been turned out, taken by the ears and thrown out as it suited the ruling coterie, is not a matter of very great honour.")।

বাংলাদেশের প্রশাসকরা অবশ্য এমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক পর্যায়ে কোন দিন আসেননি। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও এদেশের এমন নয় যে, তাঁদের মধ্যে শাসন করার মনোভাব জাগ্রত হয়। তাঁদের আর্থ-সামাজিক পটভূমিও এমন নয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিধানে 'প্রশাসক' ও 'আমলা' শব্দ এখনও ক্রোধ ও ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আমলা ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে শেখ মুজিব অনেক সময়ই ক্রুদ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে উঠতেন। বাংলাদেশের আর একজন জননেতা, মওলানা ভাসানী, আমলাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা না করে প্রায়ই বক্তব্য শেষ করতেন না। তথাপি বলতে হবে, এ দেশের শাসকরা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এবং পাকিস্তানের এলিট সিভিল সার্ভেন্টদের ঐতিহ্য সযত্নে লালন করে চলেছেন। ফলে, স্বাধীনতার আঠারো বছর পরেও প্রশাসন জনগণের কাছাকাছি আসেনি। মন্ত্রী ও জনগণের মধ্যে এখনও বিদ্যমান সন্দেহের ঘন আস্তরণ। জেলা প্রশাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও রয়েছে অতীতের শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এখনও সাধারণ লোক স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করে মনের কথা বলতে অক্ষম।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। 'এশিয়ান ড্রামা' (Asian Drama) গ্রন্থের খ্যাতনামা লেখক গুনার মিরডালকে (Gunnar Myrdal) জিজ্ঞেস করেছিলামঃ এ দেশগুলোতে কোন্ সমস্যাকে সব চেয়ে বড় সমস্যা বলে আপনি চিহ্নিত করবেন?

খুব বেশী ভাবনা-চিন্তা না করেই তিনি বলেছিলেন, খুব জোরের সঙ্গে। 'প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান, আমার মতে, তাই এসব দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা।' তিনি আরো বলেছিলেনঃ 'এ সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র পথই আমি জানি আর তা হলো উন্নয়নমূলক কাজে জনগণকে অংশীদার করতে হবে।'

এ বিষয়ে আমারও ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় সমস্যার চেহারা দেখার চেষ্টা করেছি এবং আমার মনে হয় গুনার মিরডাল যা বলেছেন এখনও তা সঠিক। প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে যে ব্যবধান তা দূর করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এ ব্যবধান যে এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া তথা জাতীয় সংহতিকে পদে পদে পর্যুদস্ত করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সমস্যার সমাধান হতেই হবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই হোক অথবা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টকরণের মাধ্যমেই হোক অথবা জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে অথবা প্রশাসনের মধ্যে উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করেই হোক--এ সমস্যার সমাধান অপরিহার্য। আর তা যত শীঘ্র সম্ভব, জাতীয় অগ্রগতির জন্যে ততই মঙ্গল।

www.pathagar.com

জনগণ ও পুলিশ

সমাজে আইনের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যবোধ সুদৃঢ় না হলে পুলিশের কর্তব্য পালন অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। পুলিশের মৌল কর্ম আইনের প্রতিপালন নয় বরং আইন ভঙ্গকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের শাস্তি বিধানের জন্য বিচারকের নিকট উপস্থাপন। বাংলাদেশের মত দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে যখন অসংখ্য ছিদ্রপথে অপরাধের জন্ম হচ্ছে, অনায়াসে যেখানে ছিন্ন হচ্ছে আইনের গ্রন্থি, এ অবস্থায় সমাজ জীবনে পুলিশের ভূমিকা রাউল্যান্ডস্ কমিটির (Rowlands Committee) কথায়, অনেকটা "হাস্য কৌতূহলোদ্দীপক থিয়েটারের অধিকারীর মত"। দায়িত্ব সীমাহীন কিন্তু ক্ষমতা সীমিত। সাধ অন্তহীন কিন্তু সাধ্য কই? বিশাল জনসমষ্টির প্রেক্ষাপট, কিন্তু পুলিশ বাহিনীর জনসংখ্যা ক্ষুদ্রতর। অপরাধের ধরন ধারণ অত্যাধুনিক কিন্তু পুলিশের প্রস্তুতি ও সাজসরঞ্জাম সনাতন। সব কিছু মিলিয়ে ভারসাম্যহীন এক অবস্থা। 'বাংলাদেশের পুলিশ' বাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি হোল এ বাহিনীর প্রয়োজন বেড়েছে হাজারো গুণ, কিন্তু এর শক্তিবৃদ্ধির জন্য, এ বাহিনীকে আধুনিক করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে সমাজ ও সময়ের উপযোগী করার ক্ষেত্রে, তেমন কোন সার্থক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এ অবস্থা অনভিপ্রেত।

পুলিশ বাহিনী ও জনগণ ঃ

পুলিশ বাহিনী এখনও জনগণের পূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়নি। এর কারণ ঐতিহাসিক। ভারতে বৃটিশ রাজের সীমিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ উপমহাদেশে একদিন যেমন গণবিচ্ছিন্ন এলিট প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়, তেমনি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ বাহিনী সংগঠিত হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলেই। পরাধীন জনপদে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম প্রীতি নয়, ভীতি। তাই ভীতির ভিত্তিতেই সংগঠিত হয় বৃটিশ আমলে পুলিশ বাহিনী। জনগণ পুলিশকে ভয় পেয়েছে, পুলিশের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে থানা পুলিশ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছে। ঐ আমলে পুলিশও জনগণের কাছাকাছি আসতে পারেনি। অধিকাংশ সময় পুলিশকে গণবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত থাকতে হোত।

স্বাধীনতা অর্জনের পরও পুলিশ বাহিনী জনগণের কাছাকাছি আসতে পারেনি। এর কারণ অনেক। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও জনগণ সরকার ও সরকারী বিভাগগুলোকে নিজস্ব বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেনি। তাই দেখা যায়, সরকার বিরোধী যে কোন আন্দোলনে সাধারণ মানুষের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হয় প্রধানত সরকারী গাড়ী আর সরকারী সম্পদ। সরকার প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠেনি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নীতি ও কার্যক্রমে জনগণের ইচ্ছাও প্রতিফলিত হয়নি। এ অবস্থায় পুলিশকে কাজ করে যেতে হয়। সরকার-বিরোধী মনোভাবের শিকারে পরিণত হতে হয়। অনেক সময় দেখা গেছে কোন জনসমর্থনহীন সরকারও পুলিশকে ঠেলে দিয়েছে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। সরকারের এক উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

বিভাগ হিসেবে পুলিশ বাহিনীকে সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর নিপীড়ন। হাজারো নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

মোট কথা, বাংলাদেশের মত উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রে (Post-Colonial State) সরকার বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত তীব্র এবং আইনের প্রতি আনুগত্য অত্যন্ত শিথিল। এ ধরনের রাষ্ট্রে পুলিশের কার্যক্রম অত্যন্ত কঠিন। সামাজিক কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে পুলিশের ভূমিকা এবং পুলিশী কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতার সমগ্র ক্ষেত্রটি প্রায় অকর্ষিত (Virgin soil)। এই দিকে সমাজের বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও পুলিশের জনবল ঃ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সনাতন সমাজ কাঠামো অতি দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে আর সাথে সাথে যে সব সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছিল, তাও ক্রমে ক্রমে শিথিল হচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতার এযুগে আধুনিকতার আলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে বটে। কিন্তু সাথে সাথে বিজাতীয় ভাবধারা আর অগ্রহণযোগ্য রীতিনীতিরও অনুপ্রবেশ ঘটছে। এছাড়াও, নগরায়ণের দ্রুত প্রসার, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার, যাতায়াত ও পরিবহণের আধুনিকায়ন আর ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র পরিসরে বিপুল জনসমষ্টির সমাবেশ, শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং সাথে সাথে বেকারত্বের প্রচণ্ড চাপ শুধু অপরাধের পরিমাণই বৃদ্ধি করেনি, অপরাধের প্রকৃতি পর্যন্ত পাল্টেছে। কিন্তু পুলিশের জনবল ও প্রস্তুতি যেমনটি ছিল তাই রয়েছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৮ কোটি এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্য ছিল প্রায় ৫৫ হাজার। ১৯৮৮ সালে জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় এগার কোটি এবং পুলিশের জনবল প্রায় ৮০ হাজার। অন্য কথায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পুলিশের জনবল বাড়েনি, যদিও উল্লিখিত কারণে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে। যে কোন উন্নত রাষ্ট্রে জনসমষ্টি ও পুলিশের অনুপাত হোল এক কোটি জনসমষ্টির জন্য অন্ততপক্ষে ৩০ হাজার পুলিশ। এ অনুপাতে বাংলাদেশ কমপক্ষে ৩ লক্ষ সদস্যের এক বাহিনী সংগঠিত হওয়া উচিত ছিল।

বাহিনীর জনবল শুধু যে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য তাই নয়, আধুনিককালের অপরাধ দমন এবং চিহ্নিত-করণের জন্যও তাদের প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণ অত্যন্ত অপ্রতুল। এদিকটি বরাবর অবহেলিত রয়েছে। দৈহিক যোগ্যতা ও কলাকৌশলে এদেশের পুলিশ অন্য কোন উন্নত দেশের শৃংখলা রক্ষাকারীর চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয় বটে, কিন্তু জনসংযোগে, জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণে, অপরাধ প্রবণতাকে ব্যাধির চোখে দেখে ব্যবস্থা দানে, বিশেষ করে সহায়তা ও সেবার মাধ্যমে জনগণের সাথে সখ্যতা স্থাপনে আমাদের পুলিশ বাহিনীকে অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে। এজন্য একাডেমীর কর্মসূচীতে যেমন পরিবর্তন আনতে হবে, তেমনি নিয়োগ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে কর্ম পরিবেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে।

পুলিশ ব্যবস্থা যে কোন সমাজের স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য সংরক্ষণে অপরিহার্য। নিয়ম-শৃংখলা অক্ষত না রাখলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়। এই শৈথিল্য ঘনীভূত হলে সমাজ

www.pathagar.com

হবসের 'প্রকৃতির রাজ্যে' পরিণত হয়। তাই সভ্য জীবন আর সুষ্ঠু সমাজের স্বার্থে দেশের পুলিশ ব্যবস্থার সংগঠন প্রথম পর্যায়ের অগ্রাধিকার দাবী করে। এই লক্ষ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পুলিশের প্রশাসনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

সরকার ও পুলিশ বাহিনী :

সরকারের প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর পুলিশ বহিনীর তৎপরতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোন সমাজে আইনের শাসন লংঘিত হলে এবং আইনের কাঠামোয় বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তার কাজ করার ক্ষমতা সীমিত হলে কারো নিরাপত্তা থাকে না। যেসব সমস্যা রাজনৈতিক, সেগুলোর রাজনৈতিকভাবেই সমাধান প্রয়োজন। দেশের সকল সমস্যাকে আইন-শৃংখলার আওতায় আনলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের দুর্দিন। তাই এদেশের পুলিশ বাহিনীকে কর্মতৎপর করার লক্ষ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অপরিহার্য। কোন উন্নত দেশে কোন রাজনৈতিক নেতা নিজের বা দলীয় স্বার্থে পুলিশকে কোনদিন ব্যবহার করে না। তাছাড়া, একজন সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে অধিক সুযোগ লাভে আগ্রহী নন। ফলে পুলিশের কার্যক্রমে ধীরে ধীরে এক নৈর্ব্যক্তিক ধারার জন্ম হয়। কিন্তু এদেশে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে এখনও পুলিশ ব্যবস্থা পরিচালিত। এর পরিবর্তন অপরিহার্য। আইনের কাঠামোয় পুলিশের কর্মকর্তাও যেন সরকারের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে পারে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

মোট কথা, দেশের জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশ বাহিনীর জনবল অপ্রতুল। এ অপ্রতুলতার সমাধান প্রয়োজন। সাথে সাথে পুলিশের নিয়োগ ব্যবস্থা নতুন আলোকে পর্যবেক্ষণ করে এক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যার ফলে দেশের প্রতিশ্রুতিবান তরুণ-তরুণীরা আকৃষ্ট হয়। পুলিশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। পুলিশের কাজ জনগণের সহায়তা ও তার সমাধান। তারই মাধ্যমে তারা জনগণের কাছাকাছি আসতে পারেন। এ পাঠ পুলিশ ব্যবস্থার সর্বস্তরে সংগ্রথিত হওয়া দরকার। তাছাড়া, পুলিশ প্রশাসনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বিভাগীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন, নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনমত উদ্বুদ্ধকরণে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা, বিশেষ করে সমগ্র বাহিনীকে সুসজ্জিত করার ক্ষেত্রে আই,জি,পি'র স্বাতন্ত্র্য এবং সর্বোপরি আইনের কাঠামোয় প্রত্যেককে নির্ভয়ে বা বিনা প্রলোভনে কাজ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে সমগ্র প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে। অন্যদিকে, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেরও প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সরকারের প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপের ফলে এ ব্যবস্থা যেন প্রাণহীন না হয়ে ওঠে তা দেখা প্রয়োজন। এক কথায়, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত এ সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সমাজের সর্বস্তরে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুলিশ ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলবিহীন সমাজ বিদ্যমান, সামরিক বাহিনী- বিহীন সমাজ কল্পনা করা যায়। এমনকি আমলাবিহীন অবস্থায় সমাজ টিকতে পারে, কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা-বিহীন সমাজ কল্পনাতীত। এ আলোকে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর সমস্যা অবলোকন করে ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত কাম্য।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র

সূচনা

গণতন্ত্র হলো এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে সরকার পরিবর্তনের রীতিসিদ্ধ সাংবিধানিক সুযোগ আর রয়েছে অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা, একাধিক রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও স্বাধীন বিচার বিভাগ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি হলো মূলতঃ দু'টিঃ কোন ব্যাপারে কারো কোন অভিযোগ দেখা দিলে আইনের প্রতি অনুগত থেকে আইনগত পন্থায় তার প্রতিবিধানের মনমানসিকতা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার কাঠামোয় সুশৃংখল আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধানের সহজলভ্য পন্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান হয় আইন পরিষদে, বিচারালয়ে বা সমিতি প্রকোষ্ঠে, আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে নয়।

পাশ্চাত্যে অধিকাংশ সমাজে গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে দু'টি মৌল অঙ্গীকারের ভিত্তিতে। সরকার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা ন্যাসী ক্ষমতা। এ ক্ষমতার প্রয়োগ হয় সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায়। সরকার তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে অথবা নির্দিষ্ট পন্থায় ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থ হলে ক্ষমতাচ্যুত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন হলো সার্বজনীন। আইনের প্রতি আনুগত্য গণতন্ত্রের বিশিষ্ট অঙ্গীকার। আইন প্রণীত হয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক। আইনে কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে সে পরিবর্তনও আনয়ন করেন জন-প্রতিনিধিবৃন্দ। আইন যদি মন্দও হয় তথাপি তা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সকলে তা মেনে চলে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার।

গণতন্ত্রের পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এখানে জোরের যুক্তির পরিবর্তে যুক্তির জোর রাজত্ব করে। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় সমঝোতা ও বিশ্বাসের আহবানে, অবিশ্বাস বা দ্বন্দ্বের কলকোলাহলে নয়। পাশ্চাত্যে মূলতঃ দু'টি কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক সার্থক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি যে সামাজিক উপত্যকা তা মোটামুটিভাবে সমতল। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সমাজে এমনভাবে বিন্যস্ত যা সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী ও গ্রুপকে তাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে। অন্য কথায়, তীব্র বৈষম্য নয় বরং চলনসই সাম্যের সবুজ ঘাসে সামাজিক উপত্যকা আচ্ছাদিত।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর গণতন্ত্রের মহান মন্ত্রে সচকিত হয়ে ওঠে। ফলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার নিয়ে তাদের রাজনৈতিক পথ পরিক্রমা শুরু করে। কিন্তু অনতিবিলম্বে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা দেয় গণতন্ত্রের বিপর্যয়। কোন কোন রাষ্ট্র গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করেছে, কোথাও বা গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ স্থগিত রয়েছে। নেপালের রাজা মহেন্দ্র ১৯৬০ সালে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৬২ সালে বার্মাও পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামরিক কর্মকর্তাদের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ লক্ষ প্রাণের

www.pathagar.com

বিনিময়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতি বাংলাদেশেও গণতন্ত্র নির্বাসিত হয় ১৯৭৫ সালে, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে। ভারতে মিসেস গান্ধী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মর্যাদা বিনষ্ট করেন। অনেকগুলো জরুরী অবস্থার ঝড়ো হাওয়ায় শুধুমাত্র শ্রীলংকায় গণতন্ত্রের বাতি টিম টিম করে এখনও জ্বলছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও একই প্যাটার্ণ দেখা দিয়েছে। ১৯৫৭ সালে ইন্দোনেশিয়া গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করেছে। কাম্পুচিয়ার দুর্বল গণতন্ত্রের প্রাণ নিঃশেষ হয়ে আসে ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে ফিলিপাইনেও সামরিক একনায়কতন্ত্রের পথ বেছে নেয়। তাই সাধারণভাবে প্রশ্ন জাগে--এসব রাষ্ট্র স্বাধীনতার সময় কেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেছে নিয়েছিল? পরবর্তীকালে কেনই বা তারা গণতন্ত্রের পথ পরিহার করলো? এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এসব প্রশ্নের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ রয়েছে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের আদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয়। ঔপনিবেশিক আমলেও গণতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা। কোন সময়ই তাঁরা গণতন্ত্রকে তাঁদের সমাজের অনুপযোগী ব্যবস্থা বলে ভাবেননি। গণতন্ত্রের আবীরে তাঁদের চিন্তা-চেতনা এমনভাবে রঙ্গিন হয়, তাঁদের রাজনৈতিক আকাঙ্খা এমনভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে যে, তাঁদের অধিকাংশই জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমার্থক মনে করতেন। জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টিতে স্বাধীন ভারত গণতান্ত্রিক ভারত ছাড়া অন্য কিছু নয়। শেখ মুজিবের সোনার বাংলা অবশ্যই গণতান্ত্রিক আদর্শের আবাসভূমি। এমন কি বিপি কৈরালার নিকট আধুনিক নেপাল নিশ্চিতরূপে ছিল গণতান্ত্রিক নেপাল।

দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা বিশেষ কতকগুলো কারণে আরও প্রাণবন্ত হয়েছিল। যে কারণে তাঁরা তাঁদের সমাজের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেন।

প্রথম, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসননীতি যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে শাসকদের হাতে ভয়ঙ্কর কার্যকর অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসননীতির নামে তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনকে শুধু যে বিদেশী ও দায়িত্বহীন বলে চিহ্নিত করতে পারতেন তাই নয়, সে শাসনকে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বলে আখ্যায়িত করতেন। এ ধরনের আক্রমণে ঔপনিবেশিক শাসনকগণও বেকায়দায় পড়তেন। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক এক সংগঠনে রূপ লাভ করে। এ নীতির ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এক অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ফলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি শুধু যে নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে তাই নয়, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার সংগ্রামেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নীতির এ অমোঘ অস্ত্র জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ শুধু যে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন তাই নয়, তাঁরা সে অস্ত্র নিজেদের সমাজে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এবং জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় সক্ষম হয়েছেন। এ শতকের চতুর্থ দশকের শেষ প্রান্তে পাকিস্তান এ

www.pathagar.com

অস্ত্রের দ্বারাই বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে "বিচ্ছিন্নতাবাদী" সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়। কারেণ, আরাকান, মং, কোচিন প্রমুখ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমনে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নীতির মাধ্যমেই বার্মায় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বৈধতার আস্বাদ লাভ করেন। কঠোর হস্তে জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় সক্ষম হন। ভারতের নেতৃবর্গও সংখ্যালঘুদের আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক আন্দোলন দমনে উদ্যত হন এ নীতির মাধ্যমে।

তৃতীয়, নেপাল ও থাইল্যান্ডের মত দেশে ক্ষমতা লাভের আশায় পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতৃবর্গ গণতন্ত্রকে এক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিক রাজার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির সংগ্রামে গণতান্ত্রিক নীতি ঐসব দেশে বৈধ পন্থা বলে স্বীকৃত হয়। পঞ্চম দশকে বি পি কৈরালার গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতেই রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে নেপালে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হন। পাকিস্তানেও দেখা গেছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে গণতন্ত্রের দাবীতে পাঞ্জাবকেন্দ্রিক ভূস্বামী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা সহযোগে যে ক্ষমতাচক্র গড়ে উঠে, আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ সে ক্ষমতা চক্রের ভিত্তি শিথিল করতে সক্ষম হন।

সর্বশেষে, দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয়ে পাশ্চাত্যে যে আনন্দ উল্লাস প্রদর্শন করে তা প্রাণ ভরে উপভোগ করেন। অজান্তে গণতন্ত্রের বিজয়ে গর্ববোধও করতে থাকেন। ফলে দেখা যায়, অনেক দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেন। প্রত্যেক দেশেই সরকার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত হন প্রধানমন্ত্রী এবং সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত হন রাজা (নেপাল) বা রাষ্ট্রপতি (ভারত, বার্মা, বাংলাদেশ) বা গভর্ণর জেনারেল (পাকিস্তান ও শ্রীলংকা)। কিন্তু হলে কি হবে, এ শতকের পঞ্চম দশক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের সবুজ পাতা বিবর্ণ হতে থাকে। ১৯৭৫ সাল নাগাদ প্রায় সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে আসে।

দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের সমস্যা ঃ

দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কেন এমন বিপর্যয় দেখা দিল তার সদুত্তর পেতে হলে সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন কোন্ অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হয় এবং কোন্ অবস্থায় তা কার্যকর হয়েছে। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) পাশ্চাত্যের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল। দীর্ঘদিন পরীক্ষা–নিরীক্ষার পরই ঐসব সমাজে গণতন্ত্র কার্যকর এক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রূপ লাভ করেছে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আসলে এক সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবেই জন্ম লাভ করে এবং সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বিকাশ লাভ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি এবং তার প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সমাজে সহমত (consensus) প্রতিষ্ঠিত হবার পরই তা রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রাচ্যে কিন্তু গণতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয় এবং এমন সব সমাজে কার্যকর করার প্রচেষ্টা হয় যেখানে গণতন্ত্রের প্রায় সকল শর্তই অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এমন সময় তাঁদের রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যখন তাঁদের সমাজ গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্তভাবে তৈরী হয়নি। এ যেন পাশ্চাত্যের চেরী কলম দক্ষিণ এশিয়ায় ভিনদেশী ও ভিন্নধর্মী মাটিতে রোপণ করা। রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শ্রেণীবিভক্ত পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে সহমত। ফলে ঐসব সমাজে গণতন্ত্র সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের সূচনা হয় এমন সময়ে যখন এখানকার সমাজ ছিল অনৈক্য, দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীভিত্তিক অসহনীয় বঞ্চনা। পাশ্চাত্যে অনৈক্য ও দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের জয় যাত্রা শুরু হয়, কিন্তু প্রাচ্য সমাজে বিদ্যমান অনৈক্য ও দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। অন্য কথায়, পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র কোন দিন যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রকে তেমন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সময় প্রমাণও করেছে, দক্ষিণ এশিয়ার এহেন সামাজিক উপত্যকায় পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র কোন দিন স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। প্রায় সর্বত্রই গণতন্ত্রের সখের চারা শুকিয়ে গেছে। যে যে ক্ষেত্রে এখনও তা টিকে আছে সেখানেও তার অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক-দুর্বল, নিস্তেজ ও বিবর্ণ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণ ঃ

কি কি কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র ব্যর্থ হলো এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন, তবে এর কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করা চলে। (এক), আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে কোন সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে কারণে এখানকার নেতৃবর্গ, তা তাঁরা ক্ষমতাসীন হোন আর ক্ষমতা লাভে উদ্যোগী হোন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে অথবা ক্ষমতা দখল ক্ষেত্রে কোন সময় স্বীকৃত গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেননি। এতটুকু সংযম তাঁরা প্রদর্শন করেননি। এর কারণ অবশ্য অনেক। পূর্বে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের অঙ্গীকার হলো -- রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা সরকারী কর্তৃত্ব এক ন্যাসী (Trust) কর্তৃত্ব, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সরকারী কর্তৃত্ব প্রায় সর্বত্রই বিবেচিত হয়েছে ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গের মহামূল্যবান সম্পদরূপে। তাঁদের জন্য সীমাহীন সুযোগের উৎস হিসেবে।

পাশ্চাত্যে সরকারী কর্তৃত্ব ন্যাসী কর্তৃত্ব। সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠান সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সরকারী কর্তৃত্বের এতটুকু অপব্যবহার সমাজে ঝড় তোলে। এ ঝড়ের মুখে ন্যাসী ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ ভাবেই পাশ্চাত্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক স্থিতিশীল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ কিন্তু পারতপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। কারণ কর্তৃত্বকে তাঁরা কোন সময় ন্যাসী কর্তৃত্ব বলে গ্রহণ করেন না।

সংবাদপত্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। তাই অতি সহজে ক্ষমতার অপব্যবহার কাহিনী জনসমক্ষে প্রচারিত হয় না। ক্ষমতা অপব্যবহারের কাহিনী জনসমক্ষে প্রচারিত হলেও যেহেতু সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমারেখা সম্পর্কে কোন সহমত

www.pathagar.com

বিদ্যমান নেই, তাই নেতৃবর্গের মধ্যে ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকার প্রবণতা অত্যন্ত দৃঢ়। ফলে যতদিন পর্যন্ত নেতৃবর্গের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা অসম্ভব না হয়ে ওঠে ততদিন পর্যন্ত তাঁরা ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকবেই। একথা শুধুমাত্র যে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে প্রযোজ্য তাই নয়, যাঁরা ক্ষমতা দখল করতে চান তাঁরাও স্বীকৃত কোন গণ্ডির মধ্যে নিজেদের কার্যকলাপকে সীমিত রাখেন না। বৈধ ও অবৈধ যে কোন পন্থায় তাঁরা ক্ষমতার আস্বাদ পেতে চান।

পরিচালনার দিক থেকে গণতন্ত্র এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ঐসব সমাজেই কার্যকর হয় যেখানে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, তার প্রয়োগ ও হস্তান্তর পদ্ধতি সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে যেহেতু এসব ক্ষেত্রে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা দখলে আগ্রহী নেতৃবর্গ এমন সব পন্থা গ্রহণ করেন যার ফলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গণতন্ত্রের শ্বেত পারাবত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- এসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুরু থেকেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণের অংশ গ্রহণ কাগজে কলমে স্বীকার করা হয়। যদিও এসব সমাজ আদিকাল থেকেই স্তরভিত্তিক ও এলিটিষ্ট। পাশ্চাত্যে কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্র জনগণের সীমিত ভোটাধিকার, সীমাহীন দারিদ্র ও নিরক্ষতার আবহাওয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চালু ছিল। পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের ব্যাপক প্রবেশাধিকার তখনই নিশ্চিত হয় যখন খণ্ডছিন্ন সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়, জনগণের অংশগ্রহণ কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মিত হয়, আইন সব মহলের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়, গণতান্ত্রিক কৃষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আর সকলে যখন সরকারী কর্তৃত্বের প্রতি স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশে রাজি হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন সময় টেনে আনা হয়েছে যখন রাজনৈতিক কাঠামো স্থিতিশীল হতে পারেনি। আইনকে সকলে শ্রদ্ধার চোখে দেখার সুযোগ লাভ করেনি। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ জনগণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। নিজেদের সংকীর্ণ পৃথিবীতে নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় তারা সম্পূর্ণ ব্যস্ত। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে করেছে ভীতসন্ত্রস্ত। ফলে তাঁরা প্রায় সময়ই গণতান্ত্রিক নীতিমালা লংঘন করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছেন। কারণে অকারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নিজেদের স্বার্থকে সমুন্নত রেখেছেন। নিয়মিত নির্বাচনকে বিলম্বিত করেছেন। এমনকি নির্বাচনে হিংসাত্মক ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

অধিকাংশ সময় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করেও তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা এবং নিজেদের শক্তির ভিতকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়ায় গণসম্মতির দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ

www.pathagar.com

উদ্ধার করেছেন। এ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের নীতিমালা ভংগ করেছেন।

এসব সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমারেখা সম্পর্কে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোন রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মিত হয়নি। রাজনীতি ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ তাই ক্ষমতা দখলে আগ্রহী নেতৃবর্গের সামনে বিক্ষোভ, ক্রুদ্ধ মিছিল ও অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপে জনগণকে জড়িয়ে সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় জাতীয় সংসদে, মন্ত্রিসভায় বা দলীয় অধিবেশন কক্ষে। তাও হয় সুশৃংখল আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে। রাস্তায় ক্রুদ্ধ মিছিলে নয় বা কোন বিক্ষোভমূলক সম্মেলনের মাধ্যমে নয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, যেসব নেতৃবর্গ এসব পন্থায় ক্ষমতায় আসীন হন তাঁরাও যে জনগণের দাবীকে ভিত্তি করে ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন অচিরে তা ভুলে যান। এভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে নড়ে উঠে।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও বার্মার মত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকায় এসব দেশে গণতন্ত্রের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে আসে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পেশাদার সামরিক বাহিনীর হাতে 'বন্দুক' থাকে সত্য, কিন্তু তা ব্যবহারের নির্দেশ অবশ্যই আসে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছ থেকে। সামরিক বাহিনীর পেশাদারিত্বের মূল কথাই হলো তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশ মান্য করার কৌশল আয়ত্ব করা। পাশ্চাত্যে সামরিক বাহিনীর প্রধানতম দায়িত্ব হলো দেশ রক্ষা, দেশের অভ্যন্তরে শান্তি–শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নয়। একাজটি ন্যস্ত হয় পুলিশ বাহিনীর উপর। সামরিক বাহিনী কোনভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে তাদের পেশাদারিত্বের অবসান ঘটে। অন্যদিকে, সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনে টেনে আনলে তার পরিণাম রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য শুভ হয় না। এর ফলে সামরিক বাহিনী একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হয়। ফলে দেখা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতন ও বেসামরিক ক্রিয়াকলাপে সংশ্লিষ্ট সামরিক বাহিনী উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

বার্মা এবং বাংলাদেশের মত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতন হয়েই সামরিক বাহিনী পথ পরিক্রমা শুরু করে। উভয় দেশেই সামরিক বাহিনীর এক বিরাট অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, উভয় ক্ষেত্রেই বেসামরিক প্রশাসনে, বিশেষ করে আইন–শৃংখলা রক্ষার্থে, সামরিক বাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। এ সবের ফলে সাধারণ জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান থাকে তা দূর হয়। দ্বিতীয়তঃ সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হয়। সুতরাং বাংলাদেশ ও বার্মায় যে উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। শুরুতে অবশ্য পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতন ছিল না, কিন্তু সামরিক বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক প্রশাসনকে নিয়মিতভাবে সহায়তাদান, সামরিক কর্মকর্তাদের শ্রেণী চরিত্র, পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার প্রতিক্রিয়া এবং বিশেষ করে পাকিস্তানের আঞ্চলিক সমস্যার জটিলতার ছিদ্রপথে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ

www.pathagar.com

ঘটে। এর ফল কি হয়েছিল তা সবার জানা।

উপসংহার ঃ

সংক্ষেপে, দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক জীবন যাত্রা শুরু করে এবং কালে সব ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে। ভারত ও শ্রীলংকায় বহুসংখ্যক জরুরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র অবশ্য কোন রকমে টিকে আছে। তবে এসব রাষ্ট্রেও গণতন্ত্রের বৃদ্ধি এবং বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে আর্থ–সামাজিক সমস্যার জটিলতা, নেতৃবর্গের অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র সফল হয়েছে, কারণ সেখানে আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও তাদের সমাধান, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং প্রয়োগ সম্পর্কে সমাজে সহমত বিদ্যমান। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে এ ধরনের কোন ঐকমত্য বিদ্যমান নেই। যেসব অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র পরিচালিত হয় দক্ষিণ এশিয়ায় তা অনুপস্থিত। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যও দক্ষিণ এশিয়ায় একদিকে যেমন নেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ, অন্যদিকে সে লক্ষ্যে রাজনৈতিক অবকাঠামোও নির্মিত হয়নি। সবশেষে, দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা–সচেতন সামরিক বাহিনী এসব দেশে গণতন্ত্রের ক্ষীণ সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দু'টি ধারা প্রবর্তিত হতে হবে। প্রথম, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন তথা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দাবী জোরদার করতে হবে। দ্বিতীয়, জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে সমাজের আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তন সূচিত করে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে হবে। সমাজে বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নেতৃত্বের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমস্যা সম্পর্কে নতুনভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন।

দক্ষিণ এশিয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বাধিক। পাকিস্তানের এককালের লৌহমানব জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট এক দুর্ঘটনায় নিহত হলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বেনজীর ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। মাত্র ২০ মাসের মাথায় অগণতান্ত্রিক পন্থায় বেনজীর ভুট্টো সরকারকে অপসারিত করেন রাষ্ট্রপতি গোলাম ইসহাক খান। পরবর্তী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মিঞা নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক সরকার পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ বছর।

১৯৯০ সাল দক্ষিণ এশিয়ায় স্বৈরাচারের পতনের বছর। এ বছরের মাঝামাঝি নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি। পরম প্রতাপশালী রাজতন্ত্র বন্দী হয়েছে

www.pathagar.com

সংবিধানের কুঠরীতে। গণতন্ত্রের পালে লেগেছে দখিন হাওয়া। ১৯৯০–এর শেষপ্রান্তে বাংলাদেশেও স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। প্রায় ন'বছর স্বৈরাচারী শাসকের দুর্বিনীত শাসন সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৯১–এর ২৭ ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রভূমি ভারতে গণতন্ত্র টিকে আছে বটে, কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলে ছোবলে ক্ষত–বিক্ষত। শ্রীলংকায় অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মৃত প্রায়। ভুটানে গণতন্ত্রের কুঁড়ি এখনও প্রস্ফুটিত হয়নি। মালদ্বীপে একদলীয় ব্যবস্থার চাপে গণতন্ত্র এখনও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। তাই প্রায় একশো কোটির অধিক জনসমষ্টি অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যকারিতার প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

এসব দেশে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল হতে পারে, কিন্তু এ সাফল্য হবে ক্ষণস্থায়ী। তা কোন সময় কল্যাণকর হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান, বার্মা ও বাংলাদেশে দেখা গেছে সামরিক শাসন পর্যুদস্ত হয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যপর্ণ করেছে, কিন্তু গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিটি গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী না হওয়ার ফলে অচিরে ঐসব দেশে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি গণতন্ত্রের নামে গণবিচ্ছিন্ন প্রতিনিধিদের কার্যক্রমও জনগণের জন্য পীড়নমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। কোন কোন সময় জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায় নিজেদের সুদৃঢ় রাখার জন্য সামরিক কর্মকর্তাদের সমর্থন লাভ করেন বা তাদের সমর্থন যোগাড় করেন। ফলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলন একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নির্বাচন, নির্বাচনের ভিত্তিতে কিছু দিনের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং শেষ পর্যায়ে জরুরী আইন বা সামরিক শাসনের মাধ্যমে আবার গণতন্ত্রের বিপর্যয়। এটা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই এসব সমাজে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বপ্রথম চাই গণতন্ত্রের ক্ষেত্রকে সযত্নে প্রস্তুত করা। আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত করে সামাজিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা এবং নতুন নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে জনগণের স্থায়ী এবং ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য তেমন উপযোগী নয়। দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করে তোলা। পাশ্চাত্যের সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরই শুধু তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। দক্ষিণ এশিয়ায় শুধুমাত্র সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তথা সমাজে সহমত রচনা করে, আইনের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরী করে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব। বিদ্যমান আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাময়িক সাফল্য অর্জন করতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করবে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রাজনীতি ঃ জেনারেল এরশাদের উত্থান ও পতন

সূচনা ঃ

নব্বই শেষ হয়েছে। বছরের শেষ প্রান্তে শেষ হয়েছে স্বৈরশাসন। সমাপ্তি ঘটেছে সীমাহীন দুর্নীতির আর অনিয়মের। ১০ অক্টোবর যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, মাত্র আট সপ্তাহের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৪ ডিসেম্বর তা লক্ষ্য অর্জন করে। জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন। ৬ ডিসেম্বরে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ গ্রহণ করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের (Free, Fair and Neutral Elections) ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মাত্র ক'মাস আগেও মনে হতো, অন্ধকারে পথ চলা বুঝি শেষ হবে না, শেষ হবে না নিশ্ছিদ্র স্বৈরশাসনের রাত্রি। দীর্ঘ ন' বছর পরে অবশেষে সমাপ্তি ঘটেছে রক্তাক্ত সংগ্রামের। জয় হয়েছে ছাত্র-জনতার, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের, পেশাজীবী ও সংস্কৃতি-সেবীদের। বিজয়ী হয়েছে রাজনীতি, শুভবুদ্ধি আর গণতান্ত্রিক চেতনার। গণতন্ত্রের পথ হয়েছে প্রশস্ত।

গণ আন্দোলনের প্রকৃতি ঃ

উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান যৌক্তিক পরিণতি লাভ করেনি। স্বৈরশাসনের দুর্গে ফাটল ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয়নি। জেনারেল আইয়ুবের পতন হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আর একজন জেনারেল, ইয়াহিয়া খান। গণদাবী প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। নব্বই-এর গণ অভ্যুত্থান বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এবারে সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে শান্তিপূর্ণভাবে। অতীতে এমনটি আর ঘটেনি। এবারে রাজনীতির বিজয় হয়েছে। আন্দোলন শেষে রাজনৈতিক জোটগুলো হয়েছে বাংলাদেশ রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। অতীতে এমনটি দেখা যায়নি। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবারে দলীয় পর্যায়ে এক ধরনের ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। অতীতে এরও কোন নজীর নেই। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ কোন দিন তার কার্যকাল সমাপ্ত করেনি। তাই নেই এর ধারাবাহিকতা, নেই কোন দৃষ্টান্ত। ১৯৭৩-এর সংসদ শেষ হয় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে। জেনারেল এরশাদ একাই ভেঙ্গেছেন তিনটি সংসদ, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চে, ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বরে এবং ১৯৯০ সালের ৫ই ডিসেম্বরে। এদেশে কোন রাষ্ট্রপতিও সমাপ্ত করেননি তাঁদের কার্যকাল। সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিব নির্মমভাবে নিহত হন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে, সপরিবারে। রাষ্ট্রপতি জিয়া এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন ১৯৮১ সালের ৩০ মে, চট্টগ্রামে। দেশে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে হত্যা বা ক্যু (coup d' etat)-এর মাধ্যমে, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নয়।

www.pathagar.com

এবারের আন্দোলনের রূপরেখা ছিল ভিন্ন। আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য থেকে শুরু করে দলীয় পর্যায় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল ঐকমত্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারই দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপতি এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে।

নব্বই-এর গণ আন্দোলন পর্যালোচনা করলে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে যতটুকু ছিল জনগণের প্রত্যাশা, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল প্রত্যাখ্যান। জেনারেল এরশাদকে প্রত্যাখ্যান, তাঁর স্বৈরশাসনের প্রত্যাখ্যান, সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের নিন্দনীয় ভূমিকার প্রত্যাখ্যানই ছিল এ আন্দোলনের মূল সুর। এ সমাজ বিভিন্ন দিক থেকে ভীষণ স্পর্শকাতর। নীতির ক্ষেত্রে কেউ কেউ আপোষ করেন বটে, কিন্তু দুর্নীতিকে সবাই ঘৃণা করেন।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতা এক কথা, কিন্তু দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে রুচিহীন, বলগাহীন জীবনধারা, অন্যায় ও অবৈধ কর্মকে ধর্মের আচ্ছাদন পরিয়ে গ্রহণযোগ্য করা--এ সমাজের রুচিবোধকে আহত করেছে ভীষণভাবে। প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসীনদের নগ্নতা সবার নীতিবোধকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। এ সবের প্রত্যাখ্যান নব্বই-এর গণ আন্দোলনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ ন' বছরে জেনারেল এরশাদ কিছুই করেননি তা ঠিক নয়। তবে তিনি যে সব ভাল কাজ করেছেন তাও তাঁর দীর্ঘ ছায়ায় মলিন। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে উপজেলা ব্যবস্থা রচিত হয়েছে, কিন্তু তার ব্যবহার হয়েছে স্বৈরশাসনের সমর্থনভিত হিসেবে। গুচ্ছগ্রাম ও পথকলির মত উত্তম প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যবস্থাপকদের লোলুপ দৃষ্টিতে কলঙ্কিত, স্তুতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন। দেশে অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণে, বিশেষ করে সেতু ও সড়ক রচনায়, জেনারেল এরশাদের ব্যাপক উদ্যোগ আর্থিক দুর্নীতি কবলিত। বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় তিনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যতটুকু উজ্জ্বল করেছেন, তার বেশ খানিকটা কালিমালিপ্ত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত নগ্নতা এবং পারিবারিক কদর্যতার জন্যে। দীর্ঘ ন' বছর ধরে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অসংখ্য গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিদর্শন করে তিনি ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন। সাথে সাথে বিস্তৃত হয়েছে দেশের সর্বত্র নীতিহীনতার ঝড়ো হাওয়ায় মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারী উদ্দামতা।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে উঠেছে অনেক অভিযোগ। গণ আন্দোলনে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠে এসেছে সে দিকে তাকালেই চলবে। তিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধ্বস্ত করেছেন। লুণ্ঠন করেছেন জাতীয় সম্পদ। অমার্জনীয় অপচয় ঘটিয়েছেন বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসনের ভাবমূর্তি অবনত করেছেন। ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বন্দী করে রেখেছিলেন নিজস্ব খেয়ালখুশীর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে।

এসব অভিযোগে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে, রয়েছে খানিকটা আক্রোশের উত্তাপ। আইনের বিধান মতো এসব অভিযোগের পর্যালোচনা হবে। তবে এও ঠিক, তিনি গণতন্ত্রের সব বাতায়ন

www.pathagar.com

বন্ধ করেই রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তার আমলে রাজনীতি হয়ে পড়েছিল ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও কূটকৌশলের নিশ্ছিদ্র দুর্গে বন্দী। সমষ্টিগত প্রজ্ঞার আলোকে তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। রাজনীতি হতে পারেনি সমাধানমূলক। বরং তা দিকে দিকে সৃষ্টি করেছে হাজারো সমস্যা। গণতন্ত্র বিকাশের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা এ সমাজে দেখা দিয়েছিল জেনারেল এরশাদের উদ্ধত থাবায় তা দলিত মথিত। নির্বাচনের মত প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশের এ অঞ্চলেই সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করে, কিন্তু জেনারেল এরশাদ পেশীর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হন যে তার দাপটে নির্বাচনের মত প্রতিষ্ঠান হারায় তার সত্তা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নৈতিক মান।

গণ আন্দোলন রাজনীতিকে নামিয়ে এনেছে রাজপথে। স্বৈরশাসনের দুর্গে ধরিয়েছে ফাটল। গণতন্ত্রের পথ সুগম হয়েছে বটে, কিন্তু স্বৈরশাসনের কালো ছায়া এখনও রয়েছে রাজনৈতিক জীবনের চারদিক ঘিরে। দীর্ঘ ন' বছরের স্বৈরশাসনের জন্যে শুধমাত্র কি জেনারেল এরশাদ দায়ী? কোন দায়িত্ব বহন করে না রাজনৈতিক দলগুলো? রাজনীতিকরা? এসব প্রশ্নও নতুন করে ভাবতে হবে।

এরশাদের ক্ষমতা দখল ঃ

নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে ক্ষমতা লাভ করলে সমগ্র কালব্যাপী সেই অনিয়ম দুঃস্বপ্নের মত ক্ষমতাসীনদের তাড়া করে ফেরে। শেষ পর্যায়ে সেই অনিয়মই ফুলে ফেঁপে তাদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জেনারেল এরশাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন। পদচ্যুত করেন মাত্র চার মাস আগে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস্ সাত্তারকে। দেশব্যাপী জারি করেন সামরিক আইন। মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদকে বাতিল করেন। স্থগিত করেন সংবিধানের কার্যকারিতা। বিচারপতি আবুল ফজল আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে নিয়োগ করেন নামেমাত্র রাষ্ট্রপতি হিসেবে। তিনি হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ যা করলেন, তিনিও জানতেন, তা অবৈধ। তাই প্রথম থেকে শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতার আবরণ দেবার তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। সামরিক শাসনকে তিনি "জনগণের সামরিক শাসন" বলেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের হাতে "জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়েছিল"-এ অজুহাতে ক্ষমতা দখলকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, "আর এক সপ্তাহ পর সামরিক আইন জারি হলে বেশ কিছু মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করত"। "সীমাহীন দুর্নীতির" কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার কথা বলেছেন। গণভোটের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলকে ডাক দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে নির্বাচিত করেছেন। দু'বছরে দু'টি সংসদের নির্বাচন ঘটিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনারেল এরশাদের সরকার অবৈধই রয়ে গেছে। ঐ গ্লানি নিয়েই তাঁকে পদচ্যুত হতে হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বে সামরিক অভ্যুত্থান নতুন নয়। তৃতীয় বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এ অভ্যুত্থান প্রথম নয়। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। এটি সুপরিকল্পিত। এর আগে বাংলাদেশে যে

www.pathagar.com

সব অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলোর মত হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা অভ্যুত্থান এটি নয়। সময় নিয়ে, ঠাণ্ডা মাথায়, লাভ-লোকসানের মূল্যায়ন করেই এর পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া, এ অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ যতটুকু জড়িত ছিল, তার অনেক গুণ বেশী ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জেনারেল এরশাদের উচ্চাভিলাষ।

ক্ষমতা দখলের বহু পূর্ব থেকেই শাণিত ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের আবরণে ঢেকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে Banladesh Army Journal পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে মেজর জেনারেল এরশাদ বলেনঃ "আমার সুস্পষ্ট দাবী, জাতীয় বাহিনী হিসেবে জাতির সমষ্টিগত উদ্যোগে সামরিক বাহিনীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত।" ('I Will re-assert my proposition that the role of the military, especially in the context of a national army, should very much be that of a participant in the collective effort of the nation.')। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় (Newyork Times) প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্যে সামরিক বাহিনীকে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান-অনুমোদিত একটি ভূমিকা দিতে হবে। ১৯৮১ সালের ৭ অক্টোবর লন্ডনের গার্ডিয়ান (Guardian) পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে মেজর জেনারেল এরশাদ বলেন ঃ "দেশের শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। তার ফলে প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর আগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি পূর্ণ হবে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হ্রাস পাবে ক্ষমতার প্রতি তাদের লোভ। এর ফলে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাও কমে যাবে ("The army should be directly associated with the governance of the country so that the military might have their commitment in administration and do their best to arrest the tendency of uprising with a view to fulfilling their ambition or the lust for power")।

কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তিনি যত উঁচু পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না, মৌল নীতি সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখেন না। রাখার কথাও নয়। জেনারেল এরশাদ এসব নীতি বা নর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না দেখিয়ে দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। এসব বিবৃতি রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় এ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলের বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনী প্রধানের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি বলেনঃ "দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ছাড়া সামরিক বাহিনীর অন্য কোন ভূমিকা থাকতে পারে না" ('The army has a role to protect the soveregnty of the country and I don't think any other role is possible')।

এতেও কিন্তু এরশাদ নিরস্ত হননি। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতির ব্যাখ্যা দেবার জন্যে জাতীয় পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে অবজারভার এবং হলিডেতে (Bangladesh

www.pathagar.com

Observer, The Holiday) বলেনঃ "আমাদের অত্যন্ত উঁচুমানের সেনাবাহিনীকে দেশরক্ষা ছাড়াও উৎপাদনমুখী ও জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে" ('.....Can be effectively utilized for productive and nation-building purposes in addition to its role of national defense') । তিনি আরও বলেন, "সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি পর্যালোচনা করতে পারে।"

শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে এরশাদের বক্তব্য বিবৃতিতে তাঁর দুটো সুবিধা হয়। যা বলার তা তো তিনি বললেন। সাথে সাথে এমন ধারণাও দিলেন, এ বক্তব্য তাঁর একার নয়। এ ব্যাপারে সমগ্র সামরিক বাহিনী তাঁর সাথে রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সতর্কতার সাথে বিষয়টি দেখতে থাকেন। গণতান্ত্রিক সমাজে অবশ্য এসব বিষয় ভিন্ন আলোকে দেখা হয়। সামরিক কর্মকর্তার নৈপুণ্য তার পেশাদারী দক্ষতায়, রাষ্ট্রীয় কোন নীতি সম্পর্কে মন্তব্যে নয়। সামরিক বাহিনী অস্ত্র ধারণ করে, কিন্তু অস্ত্র চালাবার নির্দেশ আসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে।

জেনারেল এরশাদ বুঝে সুঝে পদক্ষেপ নিতেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া যতদিন ছিলেন, এরশাদ ততদিন ছিলেন 'ভাল মানুষটি'। জিয়ার মৃত্যুর পর পরই ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ থেকে তিনি বিরত থাকেন। এর যথার্থ কারণও ছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়ার ছিল জনপ্রিয়তা। নিহত হবার পর তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতি হয় শোকাহত। তাঁর জানাজায় শোকাকুল জনতার ঢল নামে। তাদের বুক-ভাঙ্গা কান্নার ঢেউ ঢাকার বাতাসকে ভারী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, মৃত জিয়া জীবিত জিয়া থেকে অনেক বেশী জনপ্রিয়, অনেক বেশী প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য সামরিক বাহিনীর একাংশ দায়ী ছিল। তাদের দাঁড়াতে হয় জাতীয় বিবেকের কাঠগড়ায়। সে মুহূর্তে আর যাই হোক এরশাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল সম্ভব ছিল না। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাত্তার যখন শপথ গ্রহণ করেন তখন অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জেনারেল এরশাদও সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু তাঁর সব সময়ই ছিল। ঐ সংকটময় মুহূর্তেও তিনি তা ভোলেননি। মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই থেকে প্রকাশিত 'Gulf News' পত্রিকায় পাকিস্তানী সাংবাদিক মুসাহিদ হুসেনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বহু দিন পরেঃ "যখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় তখন আমি ধৈর্য ধরেছি। তখন আমি ক্ষমতা দখল করিনি। সংবিধান অনুযায়ী আমি উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দি। তখন উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন হাসপাতালে" ('After General Ziaur Rahaman had died, I was patient. I did not take over and I asked the Vice-President, who was then in hospital, to be President as is decred under the Constitution.) ।

চতুর্থ সংশোধনী আইনের পর থেকে রাষ্ট্রপতির পদটি সাজানো হয় অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যে। অসামান্য দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, ক্ষমতা প্রয়োগে পারদর্শীর যোগ্য হয়ে ওঠে সে

www.pathagar.com

পদ। প্রাজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টি–সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপযোগী হয়ে ওঠে সে পদ।

বয়স, স্বাস্থ্য ও পেশাগত অভিজ্ঞতার কারণে বিচারপতি সাত্তার কোন দিন সে পদে স্বস্তি পাননি। বারে বারে তিনি হোঁচট খেয়েছেন। সমর্থন ও সহযোগিতার জন্যে তিনি তাকিয়েছেন এদিক ওদিক। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা তা লক্ষ্য করেন। ক্ষমতা–দুর্গের সকল দরজার দিকে রাখেন সজাগ দৃষ্টি। বিচারপতি সাত্তারকে সামনে রেখেই তারা নিপুণভাবে ক্ষেত্র রচনা করেন। ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখলের পর রাষ্ট্রপতির পদকে জেনারেল এরশাদ একনায়কের পদে রূপান্তরিত করেন। সে পদ সুসজ্জিত হয় দায়িত্ব বহন না করে শুধু নির্দেশ দানের জন্যে। কারো কাছে জবাবদিহি না করে শুধু আদেশ দানের জন্যে। দায়িত্বশীল না হয়ে শুধু অন্যের উপর দায়িত্ব তুলে দেয়ার জন্যে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রিকরণের জন্যে।

বিচারপতি সাত্তারকে সামনে রেখেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের সব উদ্যোগ সম্পূর্ণ করেন। সংবিধান অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হয় এবং সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বরে। ঐ নির্বাচনে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কোন প্রার্থী তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য তা তাঁরা খোলাখুলি বলেন, ইঙ্গিতেও নয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সুস্পষ্ট। আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে জেনারেল এরশাদের মতামত সবার জানা। নাগরিক কমিটির প্রার্থী জেনারেল ওসমানীও তাঁদের পছন্দসই প্রার্থী নন। তার কারণও সুস্পষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কোন দিন এরশাদকে ভাল চোখে দেখেননি। বিচারপতি সাত্তারের পেছনে অগত্যা তাঁদের সমর্থন দিতে হয়। তারও কারণ সুস্পষ্ট। বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী বিচারপতি সাত্তারকে কথা শোনাতে পারবেন। ক্ষমতা দখল না করেও ক্ষমতায় অংশীদার হওয়া। মন্দ কি! ক্ষমতাই যখন লক্ষ্য, এও এক ধরনের প্রাপ্তি।

বিচারপতি সাত্তারও প্রথমে ছিলেন জেনারেল এরশাদের প্রতি দুর্বল। নির্বাচনী প্রচারণায় নিজের সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আস্থাভাজন আমি। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীরও শ্রদ্ধেয় আমি।" গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে অবশ্য দেখা যায়, উভয়ে উভয়কে ভুল বুঝেছিলেন। সে ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয়নি। নির্বাচনের সপ্তাহ পাঁচেক আগে এরশাদ অনুভব করেন, নির্বাচনে ডঃ কামাল হোসেনের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। তখন কোন ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী হননি। সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব দেবারও ঔদ্ধত্য দেখান। বিচারপতি সাত্তার এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন, এ মুহূর্তেই তিনি বঙ্গভবন ছেড়ে চলে যাবেন।

এরশাদ এরপর আর এগোতে সাহস পাননি। প্রতিরক্ষা বিভাগীয় গোয়েন্দা সূত্রে অবশ্য খবর পাচ্ছিলেন, ডঃ কামাল হোসেন নির্বাচনে তেমন ভাল করবেন না। বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১৯৮১ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, বিপুল ভোটাধিক্যে।

নির্বাচনের পরেও জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে শান্তিতে থাকতে দেননি। মাত্র

www.pathagar.com

চার মাসে তাঁকে সামলাতে হয়েছে চার হাজার ফ্রন্ট। এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের চাপেই রাষ্ট্রপতিকে গঠন করতে হয়েছিল উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তিন বাহিনীর প্রধানদের সমন্বয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (National Security Council)। ক্ষমতা গ্রহণের পর কিন্তু এ ধরনের পরিষদের কোন তোয়াক্কাই তিনি করেননি। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনের পর "দুর্নীতি পরায়ণ" ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ বাতিলের জন্যও জেনারেল এরশাদ চাপ দেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ বাতিলও করেন। তাতেও কিন্তু তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি।

এ জন্যে অবশ্য রাজনৈতিক দলের অবদান কম নয়। জেনারেল এরশাদ চেয়েছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। আত্মকলহ আর অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল তার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এরশাদের ছিল ক্ষুধা। আর রাজনৈতিক দল রেখেছিল তার ক্ষমতা-ভাণ্ডার খোলা। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব আর রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বর্ণসূত্রে জড়িয়েই সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন বিএনপি'তে কোন কোন্দল হয়নি, হয়নি তেমন কোন বড় ধরনের কলহ। জিয়ার মৃত্যুতে দলীয় কলহের ঢাকনি উন্মুক্ত হয়। শুরু হয় আত্মকলহ। দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পর্যায়ে বিএনপি দ্বিধাবিভক্ত হয়। দলছুট প্রবণতাও বেড়ে চলে।

জিয়ার মৃত্যুর মাত্র ক'দিনের মধ্যে নূরুল ইসলাম শিশু এবং আকবর হোসেনকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে বাদ দেওয়া হয়। অভিযোগ, তাঁরা ক্যান্টনমেন্টে যাতায়াত করে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ করেছেন। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন এগিয়ে এলে দলীয় কোন্দল জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কে হবেন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী? শাহ আজিজ না নূরুল ইসলাম শিশু? মীর্জা গোলাম হাফিজ, না বদরুদ্দোজা চৌধুরী? এ কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন দলের ডান, বাম, এমনকি কেন্দ্র পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সাত্তার সমঝোতা-প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। তাতেও দলীয় সংহতি সংরক্ষিত হয়নি। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে মন্ত্রিপরিষদের পুনর্গঠন, ডঃ এম এন হুদার উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ, মাত্র ক'দিন পরে ডঃ হুদার পরিবর্তে মোহাম্মদ উল্লাহর নিয়োগ, দলীয় পর্যায়ে তীব্র কোন্দলের নিদর্শনগুলো সবার জানা।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে একদিকে সামরিক বাহিনী প্রধানের সীমাহীন লোভ, অন্যদিকে ছিল দলীয় পর্যায়ে বিশৃংখলা। বিচারপতি সাত্তার কেন, যে কোন নেতার পক্ষে ঐ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল প্রায় অসম্ভব। বিচারপতি সাত্তার অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা সময়মত বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্য রকম হতো। গণতান্ত্রিক সমাজে তাই হয়। ক'দিন আগেও এমনি ঘটনা ঘটেছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে।

আমেরিকার বিমান বাহিনী প্রধান জেনারেল ডুগান (Dugan) ইরাকে আক্রমণ পরিচালনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করলে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিক চেনী (Dick Cheny) আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই তাকে অব্যাহতি দেন। বিচারপতি সাত্তারও জেনারেল এরশাদের বক্তব্য বিবৃতি পর্যালোচনা করেন। তাঁর চাকরির

www.pathagar.com

মেয়াদ বৃদ্ধি না করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার কথা ছিল ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ।

তা হয়নি। ২৪ মার্চ এসেছিল বিচারপতি সাত্তারের পদত্যাগের খবর। এ জন্যেও দায়ী ছিল জনৈক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। তিনিই সময়মত খবরটি এরশাদের কানে তুলে দেন। তারপরের ইতিহাস সকলের জানা। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শহিদুল ইসলামের লেখায় ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চের নাটকীয় ঘটনার একাংশ ধরা পড়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ঃ

"স্থান সেনা সদর কনফারেন্স রুম। তারিখ ২৩ শে মার্চ ১৯৮২। সময় রাত ৮–৩০ মিনিট। উপস্থিত আছেন অন্যদের মধ্যে জেনারেল রহমান, জেনারেল নূরুদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান (ডিএমও), ব্রিগেডিয়ার আমছা আমিন এবং ঢাকা ও অন্যান্য সেনানিবাসের গুটিকতক ব্যাটেলিয়ন ও ব্রিগেড কমান্ডার। নির্ধারিত সময়ে কনফারেন্স কক্ষে প্রবেশ করলেন সেনাপ্রধান এরশাদ। ভীষণ উত্তেজিত মনে হলো তাঁকে। কুঞ্চিত কপালের বিস্তৃত অবয়ব জুড়ে মৃদু ঘামের ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুপাত সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উপস্থিত সকলকে জানালেন এরশাদ ঃ 'জিয়ার মৃত্যুর পর দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি আমি। তারও আগে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত ও সংহত করতে কি না করেছি আমি। তুলনাহীন আনুগত্য ও ত্যাগের মাধ্যমে আমি সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে সেনাবাহিনী ও জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিলাম আমি। অথচ আজ রাষ্ট্রপতি সাত্তার রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত কথাবার্তা নিয়ে বরখাস্ত করতে চাচ্ছেন আমাকে।"

এরশাদের পতনঃ

জেনারেল এরশাদের উত্থান যেমন নাটকীয় তাঁর পতনও তেমনি। ১০ অক্টোবর পাঁচ, সাত এবং আট দলীয় ঐক্যজোটের সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচীর মাধ্যমে শুরু হয় আন্দোলন। ঐদিন বিকেলে ঢাকার বাইরে এক জনসভায় এরশাদ বলেছিলেনঃ "বিভিন্ন দলের নেতা–নেত্রীরা সচিবালয় অবরোধ করতে আজ পথে নেমেছেন। আজকে সত্যিই তারা পথে বসেছেন।" তিনি আরো বলেনঃ "অবরোধ করে সরকার পরিবর্তন করা যায় না। হরতালে সরকারের পরিবর্তন হয় না।" মাত্র সাত সপ্তাহের মাথায় কিন্তু সরকারের পরিবর্তন হল। গণ আন্দোলনের ঢেউ দেশব্যাপী এমন এক উত্তাল গণ–অভ্যুত্থান রচনা করে যার ফলে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এরশাদকে পথে বসতে হয়। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

দীর্ঘ ন' বছরের এরশাদ আমলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের শিক্ষাঙ্গন আর বিচার বিভাগ। শিক্ষাঙ্গনের একাডেমিক পরিবেশ কলুষিত হয়। সন্ত্রাস কবলিত হয়। ক্ষত–বিক্ষত হয় বিচার বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য। ভয়ঙ্করভাবে দলিত মথিত হয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও। দুর্নীতি ও অরুচির কবলে পড়ে দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের সুস্থতাই জাতীয় অগ্রগতির সূচক। জাতীয় নেতৃত্বের দল বিকশিত হয় শিক্ষাঙ্গনে। আইনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত। বলিষ্ঠ জীবনবোধ গড়ে তোলে উন্নত ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

অত্যন্ত সঙ্গত কারণে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় শিক্ষাঙ্গন থেকে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিবেকবান ছাত্ররাই ছিল এর নেতৃত্বে। আন্দোলনে গভীরতা দান করেছেন দেশের ব্যবহারজীবীরা। গতিবেগ দিয়েছে সংস্কৃতসেবীরা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাহায্য করেছে যৌক্তিক পরিণতি অর্জনে। সাত সপ্তাহের মাথায় পতন হলো স্বৈরাচারের।

জেনারেল এরশাদ ছিলেন একা। শেষ পর্যন্ত তিনি একাই রয়ে গেলেন। তাঁর মৃদু ভাষণ সাময়িকভাবে অনেককে কাছে টেনেছে বটে, কিন্তু ক্ষমতার প্রতি সীমাহীন লোভ আর ক্ষমতা প্রয়োগের দুর্নিবার আকর্ষণ সবার কাছ থেকে সব সময় তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। সব সময় তিনি উত্তম পুরুষ ও একবচনে কথা বলেছেন। জাতীয় কার্যক্রমে এ মানসিকতা যেমন অসৌজন্যমূলক তেমনি অরুচিকর। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি এর উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। 'Gulf News' পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারেও এর প্রকাশ রয়েছে। তিনি বলেনঃ "খুব খোলামেলা কথা। বাংলাদেশে যা দেখছেন তা আমারই জন্যে। সবটুকুই একজনের" ('Be very clear. Whatever you see in Bangladesh, it is due to me. It is a one-man show') ।

নিয়ম, নীতি বা নর্মের তিনি ধার ধারেননি। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক বাহিনী সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য অহং-দোষে কলুষিত। তিনি বলেছেনঃ " লেঃ কর্ণেল ও তার উঁচু পর্যায়ে সব কর্মকর্তার পদোন্নতির ব্যবস্থা আমি নিজেই করে থাকি। সুপ্রিম কমান্ড হেড কোয়ার্টারস্-এর মাধ্যমে ওসব ফাইল আমার কাছে আসে। হেড কোয়ার্টারস্ও আমার সচিবালয়ের একটি অংশ। দেশে এবং সামরিক বাহিনীতে যা ঘটে তার সবই আমি জানি" ('I am directly responsible for all promotions of officers of the ranks of Lt. Colonel and above since all files regadrding personnel of that rank are referred to me through the Supreme Command HeadQuarters, which is directly a part of my secretariat. I know everything that goes on inside the country and in the army.') ।

তাঁর ছিল দল। ছিল মন্ত্রিপরিষদ। কিন্তু দলও জেনারেল এরশাদের। মন্ত্রিরাও তাঁরই। জনগণের সাথে ছিল না কারো কোন সম্পর্ক। কারো ছিল না গণসমর্থন। ফলে তিনি যেভাবে তাদের ব্যবহার করতে চেয়েছেন, করেছেন। কোন প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না কারো। সখ করে মাঝে মাঝে তিনি মন্ত্রী বদলাতেন। পাশ্চাত্যে ধনাঢ্যরা বদলান গাড়ি। কেউ কেউ বদলান মেয়ে-বন্ধু। জেনারেল এরশাদ বদলাতেন মন্ত্রী, কোন কোন সময় মন্ত্রীদের দপ্তর। তাঁর আমলে ৭৬ বার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। লক্ষ্য একটিই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন হাতে এসেছে, তার পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন, প্রয়োজনবোধে সবাইকে টেনসনে রেখে, একনায়কের মত।

অন্য একনায়কের মত জেনারেল এরশাদ বিশ্বাস করতেন, সমাজের সবাইকে কেনা যায়। প্রত্যেকের রয়েছে প্রাইস ট্যাগ (price tag) । কোন ক্ষেত্রে মূল্য একটু বেশী, কোন ক্ষেত্রে খুব কম। কিনেছেনও তিনি। কোন ক্ষেত্রে পদ দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পদতল

www.pathagar.com

এগিয়ে দিয়ে। বিক্রি হতে ছুটেছেনও অনেকে, ডান, বাম নির্বিশেষে। ডানের সুবিধাবাদিতা সবার জানা। কিন্তু বামের সুযোগ সন্ধানী হুমড়ি খাওয়া সমাজের সকলকে লজ্জিত করেছে, হতবাক করেছে।

মন্ত্রিপরিষদে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না তা নয়। মন্ত্রিদের বেশ ক'জন ছিলেন দক্ষ, অভিজ্ঞ। কিন্তু হলে কি হবে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সিস্টেমে আত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শুধু অসহায় নয়, বেমানানও বটে। কোন জনসভার কথা মনে করলেই চলবে। জেনারেল এরশাদ বক্তব্য রাখতেন জনতার জন্যে, তাদের দিকে দৃষ্টি রেখে। মন্ত্রিরা কিন্তু বক্তৃতা দিতেন 'প্রভুর' জন্যে, তাঁর দিকে নজর রেখে। প্রতিযোগিতা করে বলতেনঃ "আপনার মহান নেতৃত্ব", "আপনার উৎপাদনের রাজনীতি", "আপনার দুর্জয় গতি", "এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক।" এসব বাণী দিয়ে মন্ত্রিদের বক্তৃতা শুরু হতো। জাতীয় সংসদে পর্যন্ত উচ্চারিত হতো এ ধরনের স্তুতি। একজন সম্মানীয় সদস্য বলেন ঃ "আপনার বক্তৃতা স্মরণ করিয়ে দেয় মাও সেতুং এর.....উইনস্টোন চার্চিলের.....আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ বক্তৃতা।"

এত প্রশংসায় এরশাদ হারাননি তাঁর নার্ভ। তিনি থাকতেন নিস্পৃহ। পরীক্ষা করে লোক বাছাই করেছেন। তাঁরা তো তাই করবেন। তিনি নিজের প্রয়োজনে ডেকেছেন তাঁদের। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁরা তাঁর কাছে থেকে যাবেন। ফিরে যাবার কোন পথ তাঁদের থাকবে না। এভাবে চালিয়েছেন তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদ। জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশনে মন্ত্রিদের ছবি দেখানো হতো বটে, কিন্তু তাঁদের মুখে দেওয়া হতো না বাণী। সবাক মাধ্যমের যুগে তাঁরা থাকতেন নির্বাক হয়ে। তথাপি থাকতেন। টেলিভিশনের অর্ধেক জুড়ে থাকতেন জেনারেল এরশাদ আর তাঁর পত্নী। পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে একদিন এক মন্ত্রী বলেছিলেন ঃ "জাতীয় টেলিভিশন হলো সাহেব, বিবি ও গোলামদের ভীষণ কাহিনী।"

কিনতে পারেননি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের, বিভিন্ন পেশাজীবীদের। পারেননি কিনতে জনতাকে। তাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, মিছিল করেছেন, পথে নেমেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরাই তাঁকে পথে নামিয়েছেন। ছাত্র সম্পর্কে অবশ্য তাঁর ধারণা সব সময়ই ছিল খুব স্বচ্ছ। তাদের কাছে পেতে হবে, সম্ভব হলে। নইলে তাদের রাখতে হবে বহু দূরে, শতধা বিভক্ত করে। তাদের ভাবমূর্তি ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জেনারেল টিক্কা খান পাকিস্তান সরকারকে বলেছিলেন ঃ "আমাকে আট চল্লিশ ঘন্টা সময় দাও। আমি পূর্ব পাকিস্তান তোমাদের ফিরিয়ে দেব" ('Give me forty eight hours and I give you back East Pakistan')। জানা গেছে, ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল আবদুর রহমান তেমনি বলেছিলেন জেনারেল এরশাদকেঃ "আমি ছাত্রদের এমন শিক্ষা দেব যা তারা সারাজীবন মনে রাখবে।" ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যা ঘটেছিল তাই ছিল জেনারেল রহমানের ঐ শিক্ষামূলক কর্মসূচী। সেদিন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী প্রহৃত হয় নির্মমভাবে, পশুর মত। কারো হাত ভাঙ্গে, কারো ভাঙ্গে পা, কেউ জন্মের মত হারায় চোখ। অনেকে হয় বিকলাঙ্গ। শিক্ষকরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কার্ফু জারি করে বন্দী করা হয় বাইশ শ'র মত ছাত্রকে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে।

www.pathagar.com

টিক্কা খানের দম্ভ যেমন ভেসে যায় নিরপরাধ জনতার রক্তে, জেনারেল রহমানের কর্মসূচীও তেমনি জন্ম দেয় ছাত্রদের মধ্যে নতুন প্রত্যয়ের, নতুন সংগ্রামী চেতনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। শুরু হয় নতুন প্রকরণে সংগ্রামী কর্মসূচী। ঐ যে কর্মসূচীর শুরু তার সমাপ্তি ঘটেছে নব্বই-এর গণ আন্দোলনে। সেদিনের সংগ্রাম পরিষদ আর আজকের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ভিন্ন শুধু নামে। লক্ষ্য, বিশ্বাস আর প্রত্যয়ে অভিন্ন। দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত গতিতে সে ধারা প্রবহমান। গুলি খেয়ে মরেছে, টাক চাপা পড়েছে, লাঠিপেটা হয়েছে, কিন্তু পিছু হঠেনি তারা।

ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। রয়েছে আদর্শগত বিভাজন। সব সময় ছাত্ররা যে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেছে তাও নয়। তবে ১৯৮৪-৯০ সময় কালে সন্ত্রাসের যে কালো ছায়া বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করে তা কিন্তু নতুন। ষাটের দশক থেকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সূচনা হয় তা ঠিক। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস তৎপরতা বৃদ্ধি পায় তাও ঠিক। কিন্তু সার্বক্ষণিক সশস্ত্র সন্ত্রাসের কবলে বিশ্ববিদ্যালয় আসে ১৯৮৩-এর পর।

১৪ ফেব্রুয়ারীর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এরশাদ নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। ঐ যে বলেছি, এরশাদ বিশ্বাস করতেন, সকলকে কেনা যায়। কিনেছেনও অনেককে তিনি। বহু ব্যক্তি-ছাত্রকে কিনেছেন। কাছাকাছি নিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। শুধু চেয়েছেন, ছাত্র সংগঠনগুলো যেন ঐক্যবদ্ধ না হয়। এ জন্যে ব্যক্তি-শিক্ষকের সেবাও গ্রহণ করেছেন। ছাত্র সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। শুধু চেয়েছেন, ছাত্র-শক্তিকে শতধা বিভক্ত রেখে নিজেদের সীমানায় বন্দী রাখতে। এ কৌশলে ভাল ফলও ফলেছে, বেশ খানিক দিন। বিভক্ত হয়ে ছাত্ররা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে থেকেছে লিপ্ত। নিজেদের ঘর সামলাতে হয়েছে ব্যস্ত। ফলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যও হয়ে আসে অস্ফুট। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে পারস্পরিক সংঘাতে বিদীর্ণ হতে থাকে ছাত্রঐক্য।

নির্বাচন সম্পর্কেও ছিল জেনারেল এরশাদের সুস্পষ্ট ধারণা। নির্বাচন তো শুধু দলীয় নীতি বা প্রার্থী বাছাই-এর প্রক্রিয়া নয়। নির্বাচন একদিকে যেমন আন্দোলন, অন্যদিকে তেমনি সাংগঠনিক তৎপরতা। যে ব্যক্তি নির্বাচনে গণ সমর্থন লাভ করেন তিনি হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র। লাখো জনতার ক্ষমতার প্রতীক। নির্বাচনে জনগণও লাভ করে এক চেতনা। সমাজে তাদেরও কিছু বলার আছে, কিছু করার আছে। তারা আর হাজারের হাটে হারিয়ে যাবে না। নির্বাচন এ জন্যেই এত মূল্যবান। জনগণ হয় সচেতন। নির্বাচিত প্রতিনিধিও হন সচেতন তাঁর ভূমিকা ও ক্ষমতা সম্পর্কে।

জেনারেল এরশাদ চেয়েছিলেন ক্ষমতা। জনগণের বা জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা নয়। তিনি পেয়েছেন ক্ষমতা আর ক্ষমতার সকল চাবিকাঠি নিজের হাতের মুঠোয়। এই পরিকল্পনায় নির্বাচনের কোন স্থান থাকতে পারে না। তাই তাঁর নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন ব্যবস্থা দুমড়ে মুচড়ে জনগণের কাছে অর্থহীন হয়েছে। নির্বাচনের নামে যে প্রহসন হয়েছে তাতে জনগণ রাজনীতি বিমুখ (de-politicized) হয়েছে। প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হয়েছেন

www.pathagar.com

ক্ষমতাকেন্দ্রের অনুগত সুবিধাভোগী। তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি নন। তাঁরা এরশাদের অনুগত, নিজ স্বার্থের প্রতিনিধি। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হননি। তাই তাঁদের চোখে মুখে গণ সমর্থনের সম্মানজনক সদম্ভ আভা পরিস্ফুট হয়নি। রাষ্ট্রপতিও এই দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁদের রেখেছেনসদাজাগ্রত।

জেনারেল এরশাদের আমলে যে কটা নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটির চেহারা একই। ভোটার না থাকলেও চলবে। ব্যালট বাক্স ভরলেই হলো। পছন্দমত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হবেনই।

ছাত্ররা এই কূটকৌশলের স্বরূপ জানত। গণভোট দেখেছে তারা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তাদের সামনেই হয়েছে। সংসদ নির্বাচন কতটুকু ভিন্ন হবে? তাই এরশাদের আমলে কোন নির্বাচন তাদের অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে মতানৈক্য চলতে থাকে, বহুদিন পর্যন্ত। সমগ্র ছিয়াশী ধরে এমনকি সাতাশীর শেষ প্রান্তে স্বৈরাচারের দুর্গ যখন গণরোষের ঝড়ো হাওয়ায় টলটলায়মান, তখনও এই নতুন কৌশল তাঁকে রক্ষা করে। ছাত্রঐক্য তখনও প্রাণ পায়নি। সমগ্র আটাশী ও উননব্বই ধরে চলে সে কৌশলের বিষক্রিয়া।

নতুন আলোকে এলো নব্বই। এ আলোয় ষড়যন্ত্রের ঘন অন্ধকার দূর হলো। ছিঁড়ে যায় অনৈক্যের বাধাবন্ধন। যেন গজিয়ে ওঠে অমিত তেজ স্যামসনের মাথায় কেশ। জেগে ওঠে তার সীমাহীন বিক্রম। স্মরণে আসে পূর্ব প্রতিশ্রুতি। দল-মতের উর্ধ্বে উঠে ছাত্র সংগঠনগুলো নির্মাণ করে স্বৈরাচার হঠানোর দুর্জয় কর্মসূচি।

এবারে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রী। অগ্রপথিকদের অভিযাত্রা হয় অপরাজেয় বাঙলার পাদদেশ থেকে। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডাকসুর (Ducsu) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। ছাত্রঐক্যের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয় বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক জোট। আন্দোলনের খরতাপে শক্ত হয়ে ওঠে সকল আলগা বন্ধন।

সরকার ভেবেছিল ১০ অক্টোবরের সচিবালয় অবরোধ অন্য সব কর্মসূচীর মতই হবে সাদামাটা। অর্থহীনভাবে তা শেষ হবে। তা হয়নি। ঐদিন পাঁচ জনের মৃত্যু ঘটনায় মোড় ফিরিয়ে দেয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংকল্পে যেটুকু শিথিলতা ছিল তাও ভেসে যায় পাঁচজনের তাজা রক্তে। সেদিন বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে ছাত্রনেতারা শহীদ জেহাদের রক্ত গায়ে মেখে শপথ নিয়েছিলঃ "এরশাদকে না হটিয়ে আমরা ঘরে ফিরবো না। স্বৈরাচারের পতন না ঘটিয়ে ক্লাসে ঢুকবো না।" ক্ষোভের বারুদ এতদিন জমেছে। এবারে জ্বলে উঠলো। এ আগুন আর নেভেনি। আঘাতের পর আঘাতে নেতৃত্বের সংকল্প ইস্পাত-কঠিন হয়েছে। ১২ অক্টোবরে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের হামলা, বিশেষ করে সর্বদলীয় ছাত্র নেতাদের উপর অমানবিক নির্যাতন, ১৩ অক্টোবরের ছাত্রদের জঙ্গী মিছিল গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রকে উর্বর করে তোলে। সে উর্বর ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয়।

এরশাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় দৃষ্টি রেখেছেন। ক্যাম্পাসে বহুবার ঢুকতে চেয়েছেন। পারেননি বলে তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে বলেছেনঃ "সব জায়গায় গেছি। সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছি। মক্কা মোয়াজ্জেমায় আলাহর ঘরে পর্যন্ত ঢুকেছি। যেতে পারিনি শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।"

www.pathagar.com

জেনারেল এরশাদের এ কথা ঠিক নয়। তিনি ১৯৮৩ সালে একবার সলিমুল্লাহ হল পরিদর্শনে এসেছিলেন বটে। ১৪ ফেব্রুয়ারীর পর যখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হয় তখন। ক্যাম্পাস তখন ছিল জনশূন্য। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ তখন ক্যাম্পাসে ছিল না।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আসা সম্ভব নয়, তা কেমন বিশ্ববিদ্যালয়? কিসের ক্যাম্পাস? এমন বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও চলে! ফলে শিক্ষক-ছাত্রদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার উদ্যোগ গৃহীত হলো। কিছু কিছু ছাত্রকে কাছে ডেকে তাদের হাতে অস্ত্র দেয়া হলো। তাদের মস্তান বানানো হলো। শিক্ষকদের মধ্যে ধরানো হলো ভাঙ্গন। কারণে অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করা হলো। সেশন জট তৈরী হলো। ন'বছরে সরকারী নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে প্রায় ২০ মাস। এরও দায়দায়িত্ব ছাত্র-শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ কেউ করেননি।

এবারের আন্দোলনের সময়ও সরকারের দৃষ্টি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। আন্দোলনের কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন ১৩ অক্টোবর। এ অবৈধ কাজটিকে বৈধ করার জন্যে ১৫ অক্টোবরে ১৩ তারিখ দিয়ে একটি অধ্যাদেশও জারি করেন। স্বীকৃত অস্ত্রধারীদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হয়নি। জমাট-বাঁধা অন্যায়ের পাষাণ তখন বড় বেশী ভারি হয়ে গেছে। তাই এ পর্যায়ে সরকার যা করেছেন সবটায় ব্যর্থ হয়েছে। আন্দোলনের গতি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আরো বেশী সংখ্যায় মিছিলে যোগ দিয়েছে। সাথে যোগ দিয়েছে শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবহারজীবী, শিল্পী-সংস্কৃতি সেবী, সমাজের সর্বস্তরের জনগণ।

এবারের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাকে তাই কেউ বেশী আমল দেয়নি। সরকারের বন্ধ করা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ নভেম্বর ছাত্র-শিক্ষকরা খুলে দিয়েছেন। সরকারের অবৈধ বন্ধের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে শিক্ষক-অভিভাবক হাইকোর্টে মামলা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এই ঘোষণাকে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ সকল শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। দেশের সর্বত্রই একই কাহিনী।

২৭ অক্টোবরে রাজপথ-রেলপথ অবরোধে দেশের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়ে আসে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ভারতে রামমন্দির নির্মাণ ও বাবরী মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির প্রয়াসও চলে। বড় বড় শহরে সান্ধ্য আইন জারি করে জনতার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু সবই নিষ্ফল হলো। ১০ নভেম্বর দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ২০ ও ২১ নভেম্বরে ৪৮ ঘন্টা লাগাতার হরতালের প্রস্তুতি পর্বে ১৯ নভেম্বরে তিনজোট এক ঐতিহাসিক ঐকমত্যে উপনীত হয়।

যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এখন এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এরশাদকে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক

www.pathagar.com

সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ভবিষ্যতে যেন অসংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখল সম্ভব না হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করতে হবে। এভাবে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সাথে সংযুক্ত হয় দেশের রাজনৈতিক শক্তি।

১৭ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের গণ দুশমন বিরোধী দিবসের কর্মসূচী আন্দোলনকে আরো এক ধাপ অগ্রসর করে নেয়। ২৭ নভেম্বর সশস্ত্র মস্তানদের গুলিতে নিহত হন সম্ভাবনাময় তরুণ চিকিৎসক ডাঃ সামসুজ্জামান মিলন। ঐ দিন সন্ধ্যায় দেশে জারি হয় বহু সমালোচিত জরুরী আইন আর ঢাকাসহ বড় বড় শহরে সান্ধ্য আইন। জনগণের ক্রোধ জ্বলে ওঠে প্রচণ্ডভাবে। শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। ভঙ্গ হয় সান্ধ্য আইন। কার্যকারিতা হারায় জরুরী আইন। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে–বন্দরে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। রাস্তায় নামে জনতার ঢল। লাখ লাখ মানুষের মিছিলে কম্পিত হয় দশদিক। গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে।

৩ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশে ভাষণে রাষ্ট্রপতি এরশাদ আবেগময় কণ্ঠে শেষবারের মত নমনীয়তা প্রদর্শন করে বলেন, নির্বাচনের দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন যাতে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। তাঁর পায়ের নীচে তখন আর মাটি নেই। রাজনৈতিক জোটগুলো তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করে। ৪ ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথে এভাবে নেমে আসে বাংলাদেশ–রাজনীতি। জনসমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যায় স্বৈরাচারের বলদর্পি আহবান। ভেসে আসে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা। ধ্বজাঙ্গা স্রোতের মত জনতার বিজয় উল্লাসে দেশের আকাশ–বাতাস মুখরিত হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন জোটের মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নাম ঘোষিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ৬ ডিসেম্বর হলেন বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান। এভাবে এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান হয়। জয় হয় রাজনীতিতে দেশের রাজনৈতিক শক্তির। স্বৈরশাসনে বিধ্বস্ত ছাত্রদের ভাবমূর্তি হয় উজ্জ্বল। সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তাদের গ্রহণযোগ্যতা।

গণ আন্দোলনের সূচনা হয় ঢাকায়, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত তা সীমিত থাকে ঢাকায়। এবং দেশে বড় বড় শহরে। আন্দোলনের গতি ও গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জেলা শহরে, উপজেলায়, এমনকি ইউনিয়ন পর্যন্ত। প্রথমে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে তা জনতার সম্পদে রূপায়িত হয়। এই আন্দোলনে যাঁরা নিহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন তাঁরাও সর্ব শ্রেণীর। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মিলনের মত শিক্ষক, বহুসংখ্যক ছাত্র। সাংবাদিক, শ্রমিক এমনকি পথচারী। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত হয়েছেন সরকারী নির্যাতনের শিকার। তাঁদের মোকাবেলা করতে হয়েছে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি, সান্ধ্য আইন, জরুরী আইন, এমনকি মস্তান বাহিনীর সহিংস ও সশস্ত্র হামলা। আন্দোলনে নিহত হয়েছেন ৪৫ জন এবং আহত হয়েছেন চারশ'র অধিক ব্যক্তি। সবার আত্মবিলীন ত্যাগ আর তিতিক্ষার সোনালী ফসল হলো গণতন্ত্রের এই শুভ সূচনা।

ডুবন্ত ব্যক্তি চায় সাহায্য। সবার কাছ থেকেই চায় সহযোগিতা। পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও হাত বাড়ায়। নভেম্বরের শেষ প্রান্তে, বিশেষ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সময়, দেশের এরশাদও সাহায্য পেতে চেয়েছেন। হাত বাড়িয়েছেন বিদেশী কূটনীতিকদের

www.pathagar.com

দিকে, দেশের সামরিক বাহিনীর দিকে। কিন্তু তাও নিষ্ফল হয়। সাহায্য দানকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিরা খুব কাছে থেকে দেখেছেন এরশাদকে। শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা তাঁদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জেনারেল এরশাদের নগ্ন জীবনধারা সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত। সমাজে তাঁরই নেতৃত্বে বিদেশী সম্পদের অপচয় সম্পর্কেও তাঁরা জানেন। তাঁরা দেখেছেন, প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য সত্ত্বেও দেশের দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য কিভাবে দিনে দিনে বেড়েছে আর কিছুসংখ্যক সুবিধাভোগী কিভাবে সম্পদের পাহাড় জমিয়েছেন। একদিকে প্রচুর সংখ্যক জনসমষ্টি মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে, অন্যদিকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যে ইতর জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে বিদেশী কূটনীতিকদের সহায়তায় জেনারেল এরশাদ প্রতিকূল অবস্থা থেকে উঠে আসেন। এবারে তা হয়নি।

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে দেশে কর্মরত এনজিও (NGO)-গুলো তাদের সকল কর্মসূচী স্থগিত করে। বিদেশী কূটনীতিকরাও উদাসীন হয়ে ওঠেন। গণ অভ্যুত্থানের গতি-প্রকৃতি দেখে তাঁরা হন স্তম্ভিত। যে সরকার জনগণের, বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন জনগণের আস্থা হারায়, সেই সরকার প্রধান কূটনৈতিক সৌজন্য ছাড়া আর কি পেতে পারেন? তাই তাঁদের পরামর্শ ছিল "জনগণের আস্থা অর্জন করুন"।

গণ আন্দোলনের সময় এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা ছিল সম্মানজনক। জেনারেল এরশাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামরিক বাহিনী তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে এক করে ফেলেনি। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হাসিমুদ্দিন খান সমগ্র বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখেছেন। চেয়েছেন তার রাজনৈতিক প্রধান। একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সঙ্গত কারণে জনগণকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। ফলে শেষ মুহূর্তে জেনারেল এরশাদ যে ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন তাও কাজ করেনি।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণকে নতুন বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করে, তাদের বিশ্বাস হত্যা করে না। সঠিক নেতৃত্ব সমাজকে দেয় নতুন প্রাণশক্তি, হরণ করে না কারো প্রাণ বা শক্তি। সৃজনশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা হয় সমগ্র সমাজব্যাপী পরিব্যাপ্ত, কেন্দ্রীভূত হয় না কোন এক কেন্দ্রে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিবাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, প্রতিরোধের নয়। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অনাস্থা প্রকাশ সম্ভব না হলে তা প্রকাশিত হয় ভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে। নব্বই-এর গণ আন্দোলনে জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে জনগণের রুদ্ররোষ যেভাবে ও যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্যে ছাত্র-জনতা যতটুকু দায়ী তার চেয়ে হাজার গুন বেশী দায়ী এরশাদ সরকার।

স্বৈরশাসনের পতন হয়েছে। গণতন্ত্রের হয়েছে শুভ সূচনা। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের জন্যেই এই বিবরণ। ব্যক্তি এরশাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এরশাদ আজ জনতার আদালতে। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্যে প্রয়োজন আত্মসমালোচনা, সমালোচনা নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ, আত্মপক্ষ সমর্থন নয়। গণতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করে সমাজের সকল মহলের শুভবুদ্ধি। আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে সেই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com